সাহিত্য বিচিত্রা

ওয়েস্ট বেঙ্গল পাবলিশার্স

Recommended by the West Bengal Board of Secondary Education as a Text Book for Class VII Vide Notification No. TB/76/7/T.B/142 Dated 28.12.76.

সাহিত্য-বিচিত্রা

[সপ্তম শ্রেণী]

শ্রীগৌরগোপাল দেব এম. এ. বি. টি (সাহিত্য ভারতী)
প্রধান শিক্ষক, হাকোলা উমেশচন্দ্র হাইস্কুল, হাওড়া

ও

শ্রীমধুসূদন সাহা এম. এ. বি. টি (সাহিত্য ভারতী)
সহকারী প্রধান শিক্ষক, যাদবপুর হাইস্কুল
কলিকাতা—৭০০০৩২

ওয়েস্ট বেঙ্গল পাবলিশার্স
৪, কলেজ রো• কলিকাতা-৭০০০০৯

প্রকাশক :
শ্রীশক্তিরঞ্জন গুই
৪, কলেজ রো
কলিকাতা-৭০০০০৯

নব সংস্করণ—১৯৮৩

মূল্য : ৪.৫০ পঃ

[ভারত সরকারের আনুকূল্যে স্বল্পমূল্যে প্রাপ্ত কাগজে মুদ্রিত]

মুদ্রণ :
শ্রীদুকড়ি দাস
গোপীনাথ আর্ট প্রেস
১১, প্রেমচাঁদ বড়াল স্ট্রীট,
কলিকাতা-৭০০০১২

• বিষয় সূচী •

পদ্যাংশ

গদ্যাংশ

সাহিত্য-বিচিত্রা

পদ্যাংশ



[নীচের অংশটি 'রামায়ণ' মহাকাব্য থেকে গৃহীত। পিতৃ সত্য পালনে রামচন্দ্র বনে গমন করছেন। ভারতীয় সনাতন ধর্মের অপূর্ব অনুশীলন এই পিতৃসত্য পালন। করুণ রস এই অংশটির প্রতিপাদ্য বিষয়।]

রাজ্য খণ্ড ছাড়ি রাম যান বনবাসে।
শিরে হাত দিয়া কান্দে সবে নিজ বাসে ॥
মাঝে সীতা আগে পাছে দুই মহাবীর।
তিনজন হইলেন পুরীর বাহির ॥
স্ত্রী পুরুষ কান্দে যত অযোধ্যা নগরী।
জানকীর পাশে যায় অযোধ্যার নারী ॥
যে সীতা না দেখিতেন সূর্যের কিরণ।
হেন সীতা বনে যান দেখে সর্ব্বজন ॥
সেই রাম ভ্রমেণ সোনার চতুর্দ্দোলে।
হেন প্রভু রাম পথ বাহেন ভূতলে ॥
কোথাও না দেখি হেন কোথাও না শুনি।
হাহাকার করে বৃদ্ধ বালক রমণী ॥
জগতের নাথ রাম যান তপোবনে।
বিদায় লইতে যান পিতার চরণে ॥
বুদ্ধি নাই ভূপতির হরিয়াছে জ্ঞান।
রাম বনে গেলে তাঁর কিসে বাঁচে প্রাণ ॥
জানকী সহিত যান রাম তপোবন।
রাজ্য সুখ ভোগ ছাড়ি চলিল লক্ষ্মণ ॥
যোড় হাতে বন্দে রাম পিতার চরণে।

আজ্ঞা কর বনে যাই এই তিন জনে ॥
মাথায় ঘা মারে রাজা করে হাহাকার।
মম সঙ্গে দেখা বাছা না হইবে আর ॥
এথা না রহিব আমি না রবে জীবন।
তোমার সহিত রাম যাব তপোবন ॥
শ্রীরাম বলেন 'পিতা এ নহে বিহিত।
পুত্র সঙ্গে পিতা যায় এ নহে উচিত ॥
তারে পুত্র বলি যে কুলের অলঙ্কার।
পিতৃসত্য পালিয়া শোধয়ে পিতৃধার' ॥

॥ অনুশীলনী ॥

১. রামচন্দ্রের বনগমনের দৃশ্যটি নিজের ভাষায় বর্ণনা কর।

২. রামচন্দ্র কি কারণে বনবাসে গিয়েছিলেন? সীতা ও লক্ষ্মণই বা কি কারণে রামচন্দ্রের সঙ্গী হয়েছিলেন?

৩. 'তিনজন হইলেন পুরীর বাহির'—তিনজন কে কে? পুরীর বাইরে তারা কোথায় গিয়েছিল? যাবার সময় কি ঘটেছিল? 'পুরী' শব্দের অর্থ কি?

৪. 'কোথাও না দেখি হেন কোথাও না শুনি'—কে কি দেখেননি এবং শোনেননি? তার দেখার বিষয়টির বর্ণনা দাও।

৫. 'আজ্ঞা কর বনে যাই এই তিনজনে'—কে আজ্ঞা চেয়েছিল? আজ্ঞার উত্তরে কে কি বলেছিলেন? তিনজন কে কে?

৬. পিতা এ নহে বিহিত।
পুত্র সঙ্গে পিতা যায় এ নহে উচিত ॥

—কোন্ কবিতায় আছে? কবির নাম কি? পিতা কে? পুত্র কে? পুত্রের সঙ্গে পিতার যাওয়া বিধি নয় কেন, আলোচনা কর।

৭. 'তারে পুত্র বলি যে কুলের অলঙ্কার।
পিতৃসত্য পালিয়া শোধয়ে পিতৃধার ॥

—কার লেখা? কোন্ কবিতায় আছে? প্রসঙ্গটি উল্লেখ কর। উক্তিটির মধ্য দিয়ে বক্তা কী বলতে চেয়েছেন? 'কুলের অলঙ্কার' বলতে কী বোঝায়?

৮. গদ্যরূপ দাও: ছাড়ি, কান্দে, বন্দে, মম, পরে, পালিয়া, শোধয়ে, বাহেন, হরিয়াছে।

৯. অর্থ লিখ: খণ্ড, শির, মহাবীর, জানকী, চতুর্দোলে, হাহাকার, ভূপতি, যোড়, বিহিত, অলঙ্কার, কুল, পিতৃধার।

Rama's devotion to his father



কপোতাক্ষ নদ

— মধুসূদন দত্ত

['চতুর্দশপদী কবিতাবলী' থেকে কবিতাটি গৃহীত। এটি একটি বিখ্যাত সনেট কবিতা। ফরাসী দেশে অবস্থান কালে যে স্বদেশের স্মৃতি কবির মনকে বার বার দোলা দিয়েছিল তাই কবিতাটিতে বাণীরূপ লাভ করেছে।]

সতত, হে নদ, তুমি পড় মোর মনে।
সতত তোমার কথা ভাবি এ বিরলে ;
সতত (যেমতি লোক নিশার স্বপনে
শোনে মায়া-যন্ত্রধ্বনি) তব কলকলে
জুড়াই এ কান আমি ভ্রান্তির ছলনে !—
বহুদেশে দেখিয়াছি বহু নদ-দলে,
কিন্তু এ স্নেহের তৃষ্ণা মিটে কার জলে ?
দুগ্ধস্রোতোরূপী তুমি জন্ম-ভূমি-স্তনে।
আর কি হে হবে দেখা ? যত দিন যাবে,
প্রজারূপে রাজরূপ সাগরেরে দিতে
বারি-রূপ কর তুমি ; এ মিনতি, গাবে
বঙ্গজ-জনের কানে, সখে, সখা-রীতে
নাম তার, এ প্রবাসে মজি প্রেম-ভাবে
লইছে যে তব নাম বঙ্গের সঙ্গীতে।

॥ অনুশীলনী ॥

১. কবি মাইকেল 'কপোতাক্ষ নদ' কবিতায় কপোতাক্ষের যে প্রশস্তি গেয়েছেন তা বিবৃত কর।

২. দেশমাতৃকার সম্পদ হিসেবে কপোতাক্ষ নদটি কবির কাছে কতখানি আপন তা আলোচনা করে দেখাও।

৩. 'সতত তোমার কথা ভাবি এ বিরলে'—কে কার কথা ভাবছে? কেন ভাবছে? 'বিরলে' বলতে কোথায়?

৪. 'জুড়াই এ কান আমি ভ্রান্তির ছলনে'—'আমি' কে? কি শুনে তাঁর কান জুড়িয়ে যাচ্ছে? সেটা ভ্রান্তির ছলনে কেন?

৫. 'এ স্নেহের তৃষ্ণা মিটে কার জলে?'—কার? কাকে উদ্দেশ্য করে এই কথা বলা? 'স্নেহের তৃষ্ণা' কথাটির অর্থ ব্যাখ্যা কর।

৬. 'আর কি হে হবে দেখা?'—কে কাকে এ কথা বলেছেন? বক্তা এমন কথা বললেন কেন?

৭. 'দুগ্ধস্রোতোরূপী তুমি জন্মভূমি স্তনে'—কোন্ কবিতায় আছে? কার লেখা? উদ্ধৃতিটির মূল কথাটি ব্যাখ্যা কর।

৮. 'এ মিনতি গাবে
বঙ্গজ-জনের কানে, সখে, সখা-রীতে
নাম তার'—কবি কে? কবিতাটির নাম কি? কবির 'মিনতিটি' কি? তা কেন বঙ্গ-জনের কানে পৌঁছে দেওয়া হবে? 'সখা-রীতে' শব্দটির অর্থ কি?

৯. অর্থ লিখ: সতত, বিরলে, নিশা, যন্ত্রধ্বনি, ভ্রান্তি, তৃষ্ণা, বারি, বঙ্গজ, সখা-রীতে, প্রবাসে, প্রেমভাবে।

১০. গদ্যরূপ দাও: মোর, যেমতি, স্বপনে, তব, জুড়াই, সাগরেরে, গাবে, রাজি, সইছে।

Love and attachment for the motherland.

সংকল্প সাধন



— হেমচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়

[আলোচ্য কবিতাটি একটি ইংরাজী কবিতার ছায়া অবলম্বনে রচিত। কালের নিয়মে সময় কারো জন্য অপেক্ষা করে না। মানুষের জীবনও সেরূপ ক্ষণস্থায়ী। এই ক্ষণস্থায়ী জীবনে মানুষের কাজ মানুষকেই করে যেতে হবে। কবিতাটিতে কবির কবিত্বশক্তির একটি বিশেষ পরিচয় পাওয়া যায়।]

দিন যায় ক্ষণ যায়, সময় কাহারো নয়,
বেগে ধায়, নাহি রয় স্থির ;
সহায় সম্পদ্ বল, সকলি ঘুচায় কাল
আয়ুঃ যেন শৈবালের নীর।
সংসার-সমরাঙ্গনে যুদ্ধ করে দৃঢ় পণে,
ভয়ে ভীত হ'য়ো না মানব ;
কর যুদ্ধ বীর্যবান, যায় যাবে যাক্ প্রাণ,
মহিমাই জগতে দুর্লভ।
মনোহর মূর্তি হেরে, ওহে জীব অন্ধকারে
ভবিষ্যতে ক'রো নির্ভর ;
অতীত সুখের দিনে, পুনঃ আর ডেকে এনে
চিন্তা ক'রে হ'য়ো না কাতর।
সাধিতে আপন ব্রত স্বীয় কার্যে হও রত,
এক মনে ডাক ভগবান ;
সঙ্কল্প সাধন হ'বে ধরাতলে কীর্তি রবে,
সময়ের সার বর্তমান।

॥ অনুশীলনী ॥

১. 'সঙ্কল্প সাধন' কবিতার মূল বক্তব্যটি পরিস্ফুট কর।

২. কবি মানব সমাজকে কেন কর্মে ব্রতী হতে বলেছেন?

৩. 'আয়ুঃ যেন শৈবালের নীর'—আয়ুর সঙ্গে শৈবালের নীরের তুলনাটি বুঝিয়ে দাও। এ কথা কবি কেন বললেন?

৪. 'মহিমাই জগতে দুর্লভ'—উদ্ধৃতিটির অর্থ পরিস্ফুট কর।

৫. সাধিতে আপন ব্রত স্বীয় কার্যে হও রত
একমনে ডাক ভগবান।

—কোন্ কবিতার অংশ? কবি কে? কোন্ প্রসঙ্গে এই উক্তিটি কবি স্বীয় কার্যে রত হতে এবং ভগবানকে ডাকতে বলেছেন এবং কেন?

৬. সহায় সম্বল বল, সকলি ঘুচায় কাল
আয়ুঃ যেন শৈবালের নীর।

—কোন্ কবিতায় আছে? কবি কে? কালের কাজ কি? আয়ুকে শৈবালের নীরের সঙ্গে কেন এবং কীভাবে তুলনা করেছেন কবি? 'শৈবালের নীর' কথাটির অর্থ কি?

৭. অর্থ লিখ:

সম্পদ, শৈবাল, নীর, সমরাঙ্গন, বীর্যবান, মহিমা, দুর্লভ, মনোহর, ব্রত, সঙ্কল্প, ধরাতলে, কীর্তি।

৮. সন্ধি বিচ্ছেদ কর:

সম্পদ, সমরাঙ্গন, সংসার, মনোহর, দুর্লভ।

৯. পদ পরিবর্তন কর:

দিন, ক্ষণ, স্থির, সংসার, দৃঢ়, ভীত, জগত, জীব, নির্ভর, দুর্লভ, রত, স্বীয়, সাধিত, কাতর।

১০. গদ্যরূপ দাও:

ধায়, হেরে, রবে, ডেকে, সাধিতে, নাহি, রয়।

A man must do his duties within short span of his life.



ভারতের ভাগ্য

—নবীন চন্দ্র সেন

[কাব্যাংশটি নবীন চন্দ্র সেনের 'পলাশীর যুদ্ধ' কাব্য গ্রন্থ থেকে সংকলিত। ভারতের সম্পদের কথা সুদূর প্রসারিত বলে ভারত বার বার বহিঃশত্রুর দ্বারা আক্রান্ত হয়েছে এবং প্রাচুর্যের মধ্যে ভারতবাসী লালিত বলে তারাও দুর্বল। এই বিষয়ে কবির বিশেষ আক্ষেপ কবিতাটিতে ফুটে উঠেছে।]

হায়! মা ভারত ভূমি! বিদরে হৃদয়,
কেন স্বর্ণ-প্রসূ বিধি করিল তোমারে ?
কেন মধুচক্র বিধি করে সুধাময়,
পরাণে বাধিতে হায়, মধু মক্ষিকারে ?
পাইত না অনাহারে ক্লেশ মক্ষিকরা,
যদি মকরন্দ নাহি হত সুধা সার ;
স্বর্ণ-প্রসবিনী যদি না হইত হায়!
হইত না বঙ্গভূমি অদৃষ্ট-ক্রীড়ার।
আফ্রিকার মরুভূমি সুইস্ পাষাণ
হ'তে যদি, তবে মাতঃ! তোমার সন্তান
হইত না এইরূপ ক্ষীণ কলেবর ;
হইত না এইরূপ নারী-সুকুমার।
ধমনীতে প্রবাহিত হ'ত উগ্রতর
রক্ত স্রোত ; হ'ত রক্ষ বীর্যের আধার।
আজি এ ভারত ভূমি হইত পূরিত
সজীব পুরুষ রত্নে ; দিগ্ দিগন্তর
ভারত-গৌরব-সূর্যে হ'ত বিভাসিত ;

বাঙলার ভাগ্য আজি হ'ত অন্যতর।
কল্পনে সে দুরাশায় কাজ নাই আর ;
বৃটিশ শিবির ওই সম্মুখে তোমার।

॥ অনুশীলনী ॥

১. 'ভারতের ভাগ্য' কবিতাটিতে কবি নবীন সেনের যে আক্ষেপ ফুটে উঠেছে তা বিবৃত কর। কবির এই আক্ষেপধ্বনি কেন ?

২. 'বৃটিশ শিবির ওই সম্মুখে তোমার'—কবি কে ? কোন্ কবিতায় আছে ? বৃটিশ শিবির বলতে কি বোঝানো হয়েছে ? কবির এই কথা বলবার কারণটি ব্যাখ্যা কর ?

৩. 'হইত বঙ্গভূমি অদৃষ্ট ক্রীড়ার'—কে কেন বঙ্গভূমিকে 'অদৃষ্ট ক্রীড়ার' বলেছেন ? এটা হলে কি ঘটত বঙ্গভূমিতে ?

৪. 'বাঙলার ভাগ্য আজি হত অন্যতর'—কবি কে ? কোথায় আছে ? বাঙলার ভাগ্য বদলে যেত কিভাবে ? সে আশা পূরণ হবে না কেন ? কবি কে ? কোন্ কবিতায় আছে ? বৃটিশ শিবির বলতে কি বোঝানো হয়েছে ?

৫. 'আজ এ ভারতভূমি হইত পূরিত'—কার কথা ? এটি কোন্ কবিতার অংশ ? ভারতভূমি কিসের দ্বারা পূরিত হোত ? তাতে কি হোত ? 'পূরিত' শব্দটির গদ্যরূপ কি ?

৬. অর্থ লিখ :
স্বর্ণপ্রসূ, বিধি, সুধাময়, মধুমক্ষিকা, মকরন্দ, রঙ্গভূমি, কলেবর, সুকুমার, ধমনী, বীর্য, সজীব, বিভাসিত, দুরাশা।

৭. গদ্যরূপ দাও :
বিদরে, পূরিত, তোমারে, নাহি।

Affluence sometimes makes one weak physically



নগরলক্ষ্মী

—রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

[উদ্ধৃত কবিতাটি কবির 'কথা ও কাহিনী' কাব্যগ্রন্থ থেকে নেওয়া হয়েছে। কোনো মহৎ কার্য সম্পাদন করাই বড় কথা নয় সদিচ্ছাই বড় কথা—কবিতায় এই সত্যটিই প্রতিষ্ঠা লাভ করেছে। বুদ্ধদেবের আদেশে তাঁর শিষ্যা সুপ্রিয়া নিজে ভিক্ষুণী হয়েও শ্রাবস্তী নগরের দুর্ভিক্ষ নিবারণের দায়িত্ব নিয়েছিলেন।]

দুর্ভিক্ষ শ্রাবস্তীপুরে যবে
জাগিয়া উঠিল হাহা রবে,
বুদ্ধ নিজ ভক্তগণে শুধালেন জনে জনে,
'ক্ষুধিতেরে অন্নদান-সেবা
তোমরা লইবে বলো কেবা?'
শুনি তাহা রত্নাকর শেঠ
করিয়া রহিল মাথা হেঁট
কহিল সে কর জুড়ি, 'ক্ষুধার্ত বিশাল পুরী,
এর ক্ষুধা মিটাইব আমি—
এমন ক্ষমতা নাই স্বামী।'
কহিল সামন্ত জয় সেন,
'যে আদেশ প্রভু করিছেন
তাহা লইতাম শিরে যদি মোর বুক চিরে
রক্ত দিলে হ'ত কোনো কাজ—
মোর ঘরে অন্ন কোথা আজ?'

নিশ্বসিয়া কহে ধর্মপাল,
'কী কব, এমন দগ্ধ ভাল—
আমার সোনার ক্ষেত   শুষিছে অজন্মা প্রেত,
রাজকর জোগানো কঠিন।
হয়েছি অক্ষম দীন হীন।'
রহে সবে মুখে মুখে চাহি,
কাহারো উত্তর কিছু নাহি।
নির্বাক্ সে সভা ঘরে   ব্যথিত নগরী-পরে
বুদ্ধের করুণ আঁখি দুটি
সন্ধ্যাতারা সম রহে ফুটি।
তখন উঠিল ধীরে ধীরে
রক্ত ভাল লাজ নম্রশিরে
অনাথপিণ্ডদ সুতা,   বেদনায় অশ্রুপ্লুতা,
বুদ্ধের চরণ রেণু লয়ে
মধুকণ্ঠে কহিল বিনয়ে—
'ভিক্ষুণীর অধম সুপ্রিয়া
তব আজ্ঞা লইল বহিয়া।
কাঁদে যারা খাদ্যহারা   আমার সন্তান তারা—
নগরীরে অন্ন বিলাবার
আমি আজি লইলাম ভার।'
বিস্ময় মানিল সবে শুনি—
'ভিক্ষু কন্যা তুমি যে ভিক্ষুণী,
কোন্ অহংকারে মাতি   লইলে মস্তক পাতি
এ হেন কঠিন গুরু কাজ ?
কী আছে তোমার কহো আজ'
কহিল সে নমি সবা কাছে,
'শুধু এই ভিক্ষাপাত্র আছে।

আমি দীনহীন মেয়ে অক্ষম সবার চেয়ে
তাই তোমাদের পাব দয়া—
প্রভু-আজ্ঞা হইবে বিজয়া।
আমার ভাণ্ডার আছে ভ'রে
তোমা সবাকার ঘরে ঘরে।
তোমরা চাহিলে সবে এ পাত্র অক্ষয় হ'বে,
ভিক্ষা-অন্নে বাঁচাব বসুধা—
মিটাইব দুর্ভিক্ষের ক্ষুধা।"

॥ অনুশীলনী ॥

১. 'নগর লক্ষ্মী' কবিতাটির মূল বক্তব্য নিজের ভাষায় লিখ।

২. শ্রাবস্তীপুরের দুর্ভিক্ষ দূর করবার জন্য সুপ্রিয়া কি উপায় অবলম্বন করতে চেয়েছিল? এই প্রসঙ্গে তার বক্তব্য তোমার নিজের ভাষায় লেখ।

৩. 'করিয়া রহিল মাথা হেঁট'—কে কার কথায় মাথা হেঁট করল? কথাটি কি ছিল? সে এই কথায় কী উত্তর দিয়েছিল?

৪. 'মোর ঘরে অন্ন কোথা আজ?'—কার কথা? এ কথা কেন তিনি বলেছেন?

৫. 'হয়েছি অক্ষম দীন হীন'—বক্তা কে? কেন তিনি নিজেকে দীন হীন বলেছেন? এ বলাটা কি তার পক্ষে সার্থক হয়েছে?

৬. 'আমি আজ লইলাম ভার'—'আমি' কে? সে কোন্ ভার নিতে চাইল? এর উত্তরে অন্যেরা কি বলল?

৭. 'মিটাইব দুর্ভিক্ষের ক্ষুধা'—কে কিভাবে কোথাকার দুর্ভিক্ষের ক্ষুধা মেটাবে? অন্যেরা এই ক্ষুধা মেটাতে চাইল না কেন?

৮. বুদ্ধের করুণ আঁখি দুটি
সন্ধ্যাতারা সম রহে ফুটি

—উদ্ধৃতিটি কোন্ কবিতায় আছে? কবি কে? 'করুণ আঁখির' সঙ্গে 'সন্ধ্যাতারা'র কিভাবে তুলনা করা যায়? উদ্ধৃতিটি ব্যাখ্যা কর।

৯. অর্থ লিখ: ক্ষুধার্ত, রত্নাকর, অচন্না, দীনহীন, অশ্রুপ্লুতা, বসুধা, অক্ষয়, ভিক্ষুণী।

১০. গদ্যরূপ দাও: যবে, কেবা, নিশ্বসিয়া, কব, শুষিছে, নমি।

2 Good will is necessary only, not wealth or



সুখ দুঃখ

— রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

[কবিগুরু কবিতাটিতে দুটি চিত্র পাশাপাশি এঁকেছেন। একটি এক কিশোরীর আনন্দ যা হাজার লোকের কোলাহলকে ছাপিয়ে উঠে, দ্বিতীয়টি এক কিশোরের ম্লান মুখ যা হাজার লোকের মেলাকে করে করুণ।]

বসেছে আজ রথের তলায় স্নানযাত্রার মেলা'
সকাল থেকে বাদল হল ফুরিয়ে এল বেলা।
আজকে দিনের মেলামেশা
যত খুশি, যতই নেশা
সবার চেয়ে আনন্দময় ঐ মেয়েটির হাসি—
এক পয়সায় কিনেছে ও তালপাতার এক বাঁশি।
বাজে বাঁশি, পাতার বাঁশি আনন্দ স্বরে—
হাজার লোকের হর্ষধ্বনি সবার উপরে।

ঠাকুর-বাড়ি ঠেলাঠেলি লোকের নাহি শেষ,
অবিশ্রান্ত বৃষ্টিধারায় ভেসে যায় রে দেশ।
আজকে দিনের দুঃখ যত
নাইরে দুঃখ উহার মতো
ঐ যে ছেলে কাতর চোখে দোকান পানে চাহি—
একটি রাঙা লাঠি কিনবে, একটি পয়সা নাহি।
চেয়ে আছে নিমেষ হারা, নয়ন অরুণ—
হাজার লোকের মেলাটিরে করেছে করুণ।

॥ অনুশীলনী ॥

১. কবিতাটির মূল ভাবটি ব্যক্ত কর।

২. কবি রবীন্দ্রনাথ 'সুখ দুঃখ' কবিতাটিতে একই সঙ্গে আনন্দ ও বেদনার যে চিত্র এঁকেছেন তা তোমার নিজে ভাষায় ব্যক্ত কর।

৩. 'সবার চেয়ে আনন্দময় ঐ মেয়েটির হাসি'—মেয়েটি কোথায় এসেছে? তার মুখে আনন্দের হাসি কেন? মেলা কোথায় বসেছে?

৪. 'নাইরে দুঃখ উহার মতো'—কার? কেন তার দুঃখ? তার দুঃখ মেলায় কি ভাবে ফুটে উঠেছে?

৫. 'হাজার লোকের মেলাটিরে করেছে করুণ'—কিসের মেলা? কোথায় বসেছে? মেলাটিতে হাসি ফুটে উঠেছে কখন? কখন তা করুণ হয়েছে? কেন করুণ হয়েছে?

৬. আজকের দিনের মেলামেশা
যত খুশি, যতই নেশা
সবার চেয়ে আনন্দময় ঐ মেয়েটির হাসি

—কার লেখা? কোন্ কবিতায় আছে? কোন্ প্রসঙ্গে এই উক্তি? উক্তিটির মূল অর্থটি নিজের ভাষায় লেখ।

৭. চেয়ে আছে নিমেষ হারা নয়ন অরুণ
হাজার লোকের মেলাটিরে করেছে করুণ

—কোন্ কবিতার অংশ? কবির নাম দাও। কে কেন নিমেষ হারা? তার নয়ন অরুণ কেন? সে কিভাবে মেলাটিকে করুণ করে তুলেছে তা নিজের কথায় ব্যক্ত কর।

৮. অর্থ লিখ: বাদল, আনন্দময়, হর্ষধ্বনি, অবিশ্রান্ত, কাতর, নিমেষ হারা, অরুণ, করুণ।

Two pictures — one for the haves and other for the havenots



[কবিতাটিতে কবি সুললিত বাংলা ভাষার প্রশস্তি গেয়েছেন।]

মোদের গরব, মোদের আশা আ মরি, বাংলা ভাষা!
তোমার কোলে, তোমার বোলে, কতই শান্তি ভালবাসা!
কি জাদু বাংলা গানে!
গান গেয়ে দাঁড় মাঝি টানে!
গেয়ে গান নাচে বাউল, গান গেয়ে ধান কাটে চাষা।
এই ভাষাতেই নিতাই গোরা
আনল দেশে ভক্তি ধারা,
আছে কৈ এমন ভাষা এমন দুঃখ শ্রান্তি নাশা!
বিদ্যাপতি, চণ্ডী, গোবিন,
হেম, মধু, বঙ্কিম, নবীন,
এই ফুলেরই মধুর রসে বাঁধল সুখে মধুর বাসা।
বাজিয়ে রবি তোমার বীণে
আনল মালা জগৎ জিনে
তোমার চরণ তীর্থে আজি জগৎ করে যাওয়া-আসা।
এই ভাষাতেই প্রথম বোলে,
ডাকনু মায়ে 'মা' 'মা' বলে,
এই ভাষাতেই বল্‌ব 'হরি' সাঙ্গ হলে কাঁদা-হাসা।

॥ অনুশীলনী ॥

১. কবিতাটির ভাববস্তুটি লিখ।

২. 'বাংলা ভাষা' কবিতায় বাংলা ভাষার প্রতি কবির যে প্রীতির পরিচয় পাওয়া যায় তা আলোচনা কর।

৩. 'কি জাদু বাংলা গানে'—বাংলা গানে জাদুর কী পরিচয় পাওয়া যায় ?

৪. 'আনল দেশে ভক্তি ধারা'—কে ভক্তিধারা আনল ? কিসের মাধ্যমে ? তাঁদের সম্বন্ধে কি জান ?

৫. 'এই ফুলেরই মধুর রসে বাঁধল সুখে মধুর বাসা'—কোন্ ফুল ? কারা মধুর বাসা বেঁধেছে ? তাঁদের মধ্যে দু'জনের পরিচয় দাও। 'মধুর রস' বলতে কী বোঝায় ?

৬. 'এই ভাষাতেই প্রথম বোলে'—কোন্ ভাষাতে ? 'প্রথম বোল' কি ? এই ভাষাতে আর কী বলি ?

৭. বাজিয়ে রবি তোমার বীণে
আনল মালা জগৎ জিনে
তোমার চরণ তীর্থে আজি জগৎ করে যাওয়া-আসা

—কার লেখা ? কবিতাটির নাম কি ? কার বীণায় কে জয়মালা এনেছে ? উদ্ধৃতিটির মূল অর্থটি লেখ।

৮. এই কবিতায় কবি কোন্ কোন্ লেখকের ও কবির নাম উল্লেখ করেছেন ? কারা কারা গান গায় ? কে বিশ্বজয়ী হয়েছেন ?

৯. 'এই ভাষাতেই বলব 'হরি' সাঙ্গ হলে কাঁদা-হাসা'—জীবনের কোন্ সময়ে 'হরি' বলা হয় ? 'হরি' বলি কেন ? কাঁদা-হাসা বলতে কবি কি বোঝাতে চেয়েছেন ?

১০. অর্থ লিখ :

বোলে, শ্রান্তিনাশা, বীণে, জিনে, চরণতীর্থে, সাঙ্গ।

১১. গদ্যরূপ দাও :

মোদের, গোবিন, জিনে, ডাকনু।

Glory of the Bengal language.

ইলশেগুঁড়ি



— সত্যেন্দ্রনাথ দত্ত

[ছন্দের যাদুকর সত্যেন্দ্রনাথ দত্ত এই কবিতায় নূতন ছন্দ মাধুর্য সৃষ্টি করেছেন। ইলশে গুঁড়ি বৃষ্টি একটি স্বপ্ন লোকের স্বাদ এনেছে, প্রকৃতির বুকে সৃষ্টি করেছে আনন্দের হিল্লোল।]

ইল্‌শে গুঁড়ি! ইল্‌শে গুঁড়ি!
ইলিশ মাছের ডিম।
ইল্‌শে গুঁড়ি! ইল্‌শে গুঁড়ি!
দিনের বেলায় হিম।
কেয়াফুলে ঘুণ লেগেছে,
পড়তে পরাগ মিলিয়ে গেছে,
মেঘের সীমায় রোদ জেগেছে,
আলতা-পাটি শিম।
ইল্‌শে গুঁড়ি! হিমের কুঁড়ি!
রোদ্দ্‌ুরে রিম ঝিম।

হালকা হাওয়ায় মেঘের ছাওয়ায়
ইল্‌শে গুঁড়ির নাচ।
ইল্‌শে গুঁড়ির নাচন দেখে
নাচ্‌ছে ইলিশ মাছ।

ইল্‌শে গুঁড়ি— পরীর ঘুড়ি
কোথায় চলেছে?
ঝুমরো চুলে ইল্‌শে গুঁড়ি
মুক্তো ফলেছে।

ধানের বনে চিংড়ি গুলো
লাফিয়ে ওঠে বাড়িয়ে নুলো ;
ব্যাঙ ডাকে ওই গলা ফুলো,
আকাশ গলেছে।
বাঁশের পাতায় ঝিমোয় ঝিঁঝিঁ
বাদল চলেছে।

*   *   *

ইল্‌শে গুঁড়ি! ইল্‌শে গুঁড়ি!
পরীর কানের দুল!
ইল্‌শে গুঁড়ি! ইল্‌শে গুঁড়ি!
ঝুরো কদম ফুল।
ইল্‌শে গুঁড়ির ঘুন্ সুড়িতে
ঝাড়ছে পাখা—টুনটুনিতে
নেবু ফুলের কুঞ্জটিতে,
দুলছে দোদুল দুল,
ইল্‌শে গুঁড়ি মেঘের খেয়াল
ঘুম-বাগানের ফুল।

।। অনুশীলনী ।।

১. 'ইল্‌শে গুঁড়ি কবিতায় কবি ইল্‌শে গুঁড়ি বৃষ্টির যে রূপচিত্র অংকন করেছেন তার বর্ণনা দাও। ইল্‌শে গুঁড়ির মূল বৈশিষ্ট্য কি ?

২. ইল্‌শে গুঁড়ি কিসের মত দেখতে ? কবি ইল্‌শে গুঁড়িকে কার কার সঙ্গে তুলনা করেছেন ?

৩. 'ইল্‌শে গুঁড়ির নাচ'—কিসে ইল্‌শে গুঁড়ি নাচছে ? তা দেখে আর কে নাচছে ? ইল্‌শে গুঁড়িকে দেখে ধানের বনে কি ঘটছে ?

৪. ইল্‌শে গুঁড়িকে 'পরীর কানের দুল' 'ঝুরো কদম ফুল' এবং 'মেঘের খেয়াল' বলা হয়েছে কেন ?

৫. অর্থ লিখ : হিম, পরাগ, আলতা-পাটি, নুলো, ঝুরো কদম, দোদুল।

Feelings in drizzling. An experimental metre in Bengali by the poet



স্মৃতিচিহ্ন

— কামিনী রায়

[কবিতাটি কামিনী রায়ের বিখ্যাত কাব্য গ্রন্থ 'আলো ও ছায়া' থেকে গৃহীত। ধনী ব্যক্তির বিশাল সৌধের চেয়ে মহা পুরুষগণের কীর্তিই শ্রেষ্ঠ স্মৃতি-চিহ্ন। এটাই কবিতাটির বিষয় বস্তু।]

ওরা ভেবেছিল মনে আপনার নাম
মনোহর হর্ম্য রূপ বিশাল অক্ষরে
ইষ্টক-প্রস্তরে রচি চিরদিন তরে
রেখে যাবে! মূঢ় ওরা, ব্যর্থমনস্কাম।
প্রস্তর খসিছে ভূমে প্রস্তরের 'পরে,
চারিদিকে ভগ্নস্তূপ, তাহাদের তলে
লুপ্তস্মৃতি, শুষ্ক তৃণ কাল-নদী জলে
ভেসে যায় নামগুলি, কেবা রক্ষা করে?
মানব-হৃদয়-ভূমি করি' অধিকার,
ক'রেছে প্রতিষ্ঠা যারা দৃঢ় সিংহাসনে,
দরিদ্র আছিল তারা, ছিল না সম্বল
প্রস্তরের এত বোঝা জড় করিবার,
তাদের রাজত্ব হের অক্ষুণ্ণ কেমন—
কাল-স্রোতে ধৌত নাম নিত্য সমুজ্জ্বল।

॥ অনুশীলনী ॥

১. কবিতাটির ভাববস্তু ব্যাখ্যা কর।

২. 'স্মৃতিচিহ্ন' কবিতাটি কাদের লক্ষ্য করে রচিত? তাদের স্মৃতি কিভাবে রক্ষিত হয়?

৩. 'ওরা ভেবেছিল মনে'—কারা? কি ভেবেছিল? সেটা কিভাবে রেখে যাবে?

৪. 'মূঢ় ওরা, ব্যর্থ মনস্কাম'—কাদের মূঢ় বলা হয়েছে? তারা মূঢ় কেন? তাদের মনস্কাম ব্যর্থ হবে কিভাবে?

৫. 'ভেসে যায় নামগুলি'—কাদের নাম? কোথায় ভেসে যায় এবং কিভাবে?

৬. 'মানব-হৃদয়-ভূমি করি' অধিকার।
করেছে প্রতিষ্ঠা যারা দৃঢ় সিংহাসনে

—কার লেখা? কোন্ কবিতায় আছে? প্রসঙ্গটি উল্লেখ করে ব্যাখ্যা কর।

৭. 'দরিদ্র আছিল তারা'—কারা? দরিদ্র হলেও তারা কি পেয়েছে? কেন পেল?

৮. তাদের রাজত্ব হেন অক্ষুণ্ণ কেমন—
কাল-স্রোতে ধৌত নাম নিত্য সমুজ্জ্বল।

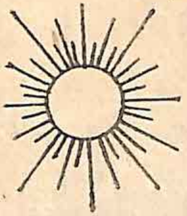
—কবি কে? কবিতাটির নাম কি? কারা রাজত্ব অক্ষুণ্ণ রাখবে? কাল-স্রোতেও তারা কিভাবে উজ্জ্বল হয়ে থাকবে এবং কেন?

৯. অর্থ লিখ:
হর্ম্য, মনোহর, মূঢ়, মনস্কাম, শুষ্ক, দৃঢ়, সম্বল, ধৌত, সমুজ্জ্বল।

১০. সন্ধি বিচ্ছেদ কর:
মনোহর, ব্যর্থ, মনস্কাম, সিংহাসন, সমুজ্জ্বল।

———

The fame of the great stays forever not the colossal foundation of things!



জীবন ও সূর্য

—কাজী নজরুল ইসলাম

[কবিতাটিতে কবি কিশোর কিশোরীদের জীবনটিকে সূর্যের আদর্শে গড়ে তুলবার নির্দেশ দিয়েছেন। কবিতাটি বাংলা সাহিত্যে স্বমহিমায় সমুজ্জ্বল।]

ভোরের বেলায় পূবগগনে সূর্যিঠাকুর দেন উঁকি,
বলেন, "অলস, জড়ের মতন বসে বসে ভাবছ কি ?
আমার আকাশ-মায়ের কোলে জাগি আমি ভোরবেলায়,
আমার হাসির উচ্ছলতা বনে বনে ফুল ফোটায়।
ক্রমেই যত উর্দ্ধে উঠি, ততই আমি হই প্রখর,
শক্তি তেজের উজ্জ্বল দ্যুতি ছড়াই বিশ্ব ভুবন 'পর।
রঙে রঙে রাঙাই আকাশ, যখন সাঁঝে অস্ত যাই,
ত্রিলোক মলিন মোর বিদায়ে, যাবার বেলা দেখতে পাই।
তোমার জীবন এম্‌নি হবে, শৈশবে আনন্দময়,
যেথায় যাবে সেথাই যেন নূতন প্রাণের লহর বয়।
তোমার শক্তি-তপস্যাতে আস্‌বে কাছে উর্দ্ধলোক,
তোমার আলোক ঘুচিয়ে দেবে ত্রিজগতের দুঃখ শোক।
এই পৃথিবীর আঁধার যত, এই মানুষের সকল ভয়
করবে মোচন শক্তি দিয়ে, শৌর্য দিয়ে, হে দুর্জয় ;
দেশের—জাতির লজ্জা, গ্লানি, কলঙ্ক ও অসম্মান
তোমার তেজে দগ্ধ হবে, জাগবে বুকে নূতন প্রাণ।
যে সব আত্ম-বিশ্বাসী ভয়ের গুহায় লুকিয়ে রয়,
তোমার ডাকে আস্‌বে ছুটে হে তেজোবীর, হে দুর্জয়।
যে আদর্শ—মানুষ আজও জন্মেনিক এ ধরায়,
তুমিই হবে সেই সে মানুষ অধ্যবসায়, তপস্যায়।"

The Sun should be the ideal of every man

॥ অনুশীলনী ॥

১. কবি 'জীবন ও সূর্য' কবিতায় সূর্যের সঙ্গে জীবনের যে তুলনা করেছেন তা নিজের ভাষায় লিখ।

২. 'অলস, জড়ের মতন বসে বসে ভাবছ কি?'—কে কাদের বলেছে? এই বলার তাৎপর্য কি?

৩. 'আমার আকাশ-মায়ের কোলে জাগি আমি ভোরবেলায়'— কে ভোরের বেলায় জাগে? জেগে সে কি কি কাজ করে?

৪. 'ত্রিলোক মলিন মোর বিদায়ে'—বিদায়টি কে নিচ্ছে? বিদায় নেবার সময় সে কি করে এবং কি দেখে? ত্রিলোক কাকে বলে?

৫. 'তোমার জীবন এম্‌নি হবে'— কার জীবন? তার জীবন কেমনটি হবে তা উল্লেখ কর।

৬. 'তোমার আলোক ঘুচিয়ে দেবে ত্রিজগতের দুঃখ-শোক'—'ত্রিজগৎ' কাকে বলে? কিভাবে ত্রিজগতের দুঃখ-শোক ঘুচবে তা বুঝিয়ে দাও। কোন্ কবিতায় এই অংশটি আছে?

৭. 'তোমার তেজে দগ্ধ হবে, জাগবে বুকে নূতন প্রাণ'—কবি কে? কবিতাটির নাম কি? উদ্ধৃতিটির মূল অর্থ টি ব্যাখ্যা করে বুঝিয়ে দাও।

৮. ক্রমেই যত উর্দ্ধে উঠি, ততই আমি হই প্রখর।
শক্তি তেজের উজ্জ্বল দ্যুতি ছড়াই বিশ্বভুবন 'পর

— কোন্ কবিতা থেকে উদ্ধৃতিটি নেওয়া হয়েছে? কবির নাম কি? 'আমি' কে? 'শক্তি তেজ' বলতে কি বোঝায়? উদ্ধৃতিটির মাধ্যমে কবি কার সঙ্গে কার তুলনা করেছেন? এই তুলনাটি ব্যাখ্যা কর।

৯. যে আদর্শ—মানুষ আজও জন্মেনিক এ ধরায়
তুমিই হবে সেই সে মানুষ অধ্যবসায়, তপস্যায়।

—উদ্ধৃতিটি কোন্ কবিতায় আছে? কবি কে? কোন্ প্রসঙ্গে এই উক্তি? উক্তিটির তাৎপর্য দাও।



মানুষ

—যতীন্দ্র নাথ সেন গুপ্ত

[কবিতাটিতে কবি বাংলা দেশের কৃষক সম্প্রদায়ের এক করুণ চিত্র এঁকেছেন। তথাকথিত উচ্চ শ্রেণীর মানুষ যাদের করুণার চোখে দেখে—তারাই সত্যিকারের মানুষ।]

পাটনি লইয়া গরুর পালের পিছনে যারা
চলেছে দূরের মাঠে,
ছিন্ন বসন, নিবারিতে ঘন শ্রাবণ ধারা
মাথায় নাহিক আঁটে।

গাভীর পুচ্ছ ধরি' যারা তরে বর্ষা নদী
জুটে না পারের কড়ি,
হারা বাছুরের সন্ধানে ফেরে সন্ধ্যাবধি
কাদায় কাঁটায় পড়ি।
ক্ষুধার অন্ন, পরনের বাস, বাসের গেহ
তাদের যদি না মেলে,
ঘৃণা কি করুণা করো না তাদের, করো গো স্নেহ
—তারা মানুষেরই ছেলে।

জ্যৈষ্ঠ-তুপুরে গলদ-ঘর্ম, বলদ লয়ে
চষে যারা রাঙা মাটি,
কত না ঝঞ্ঝা মুষলের ধারা মাথায় বয়ে
ক্ষেত করে পরিপাটি।

* * *

ঘৃণা কি করুণা করো না তাদের, শ্রদ্ধা কর,
—তারা মানুষেরই ভাই।

নির্বোধ যারা, দুর্বোধ যারা পল্লী পারে,
অশ্লীল যার ভাষা,
আশি শতাব্দী ধরিয়া যাদের দৈন্য বাড়ে—
চির-নাবালক চাষা।
হলের ফলকে লক্ষ্মী উঠিলে, করিয়া দান
লক্ষ্মীমানের ঘরে,
দুর্ভিক্ষের ভিক্ষার ঝুলি ভরিয়া প্রাণ
দেয় যারা নিজ করে।

বেতসের মত সভ্য শিক্ষা শেখেনি যারা
হাওয়ার নেশায় মাতি'—
বটের মতন খোলা মাঠে আজও রয়েছে খাড়া,
—তারা মানুষেরই জাতি।

॥ অনুশীলনী ॥

১. কবিতাটিতে দরিদ্র কৃষকদের যে করুণ চিত্র আঁকা হয়েছে তা বিবৃত কর।

২. মানুষ কাদের বলা হয়েছে এবং কেন ?

৩. এই জগতে নির্বোধ কারা ? তারা কোন্ কোন্ দিকে নির্বোধ ?

৪. 'তারা মানুষেরই ছেলে'—'তারা' বলতে কাদের বোঝান হয়েছে ? তারা কি করে ? তাদের কিসের অভাব ? কবি তাদের মানুষেরই ছেলে বলেছেন কেন ? তাদের স্নেহ ও শ্রদ্ধা করতে বলা হয়েছে কেন ?

৫. 'বেতসের মত সভ্য শিক্ষা শেখেনি যারা
হাওয়ার নেশায় মাতি'

—কবি ও কবিতার নামটি দাও ? কারা সভ্য শিক্ষা শেখেনি ? কবি উক্তিটির মধ্য দিয়ে কি বলতে চেয়েছেন ?

৬. অর্থ লিখ : ছিন্ন, পুচ্ছ, ঝঞ্ঝা, মুষল, দুর্বোধ, নির্বোধ, দৈন্য।

Poor peasants are actually true men[...] [...] should not be looked down upon. [...]



মায়ের প্রতিমা

— মোহিতলাল মজুমদার

[পূজা মন্ত্র পাঠ বড় কথা নয়। দুর্গা মায়ের করুণাময়ী মুখচ্ছবিই **সমস্ত দুঃখ-হরা**। শিশুর আক্ষেপ 'মা' বড়ই দেরীতে আসেন আর কাছে থাকেন **অল্পক্ষণ**। শিশু-মনের এই আকুতিই এই কবিতার মূল কথা।]

ঝক্‌ঝকে নীলাকাশ সোনা ঢালা রোদ্দুর,
ভোর হ'তে 'কাঁই না না' আর সানায়ের সুর।
আজ পূজো সত্যি রে! এবারে যে ভাল আছি,
আর বার জ্বরে পড়ি ঠিক পূজো কাছাকাছি।
একেবারে আসে না ত' মা যে বড় দেরী করে।
সিঁদুরের দাগ বাঁশে, তারও কত দিন পরে।
সিঙ্গিটা ঠিক হ'তে কত দিন লাগে ভাই?
পাল কাকা কেন এত দেরী করে ভাবি তাই।
চশ্‌মাটি চোখে দিয়ে সেই চোখ ভুরু টানা
কতবার স'রে এসে দেখে মার মুখখানা।

যত ভাবি আর কেন? তত দেখি আরো আছে!
শেষ কালে চিনি ঠিক মা-তো এই আসিয়াছে।
প্রতিবার মন থেকে ঠিক গড়ে ছবিখানি।
পুরুতের চেয়ে আমি তাই তারে বড় মানি।
পরশু ত দিন ভ'র চিত্তির হ'ল চাল,
আঁচলা ও মটুকেতে সাজাইল মালী কা'ল।

আর মোটে তিন দিন তারপর সব শেষ
পূজো মানে শেষ করা তার চেয়ে গড়া বেশ।
চট্ ক'রে গড়ে যদি রেখে দেয় তিন মাস।
প্রাণ ভ'রে দেখে নিই তবে বুঝি মেটে আশ।
আগে মার মুখ দেখে ভ'রে যায় অন্তর
তারপর পূজো পাট যত কিছু মন্তর।

॥ **অনুশীলনী** ॥

১. 'মায়ের প্রতিমা' কবিতায় শিশুমনের যে আকুতিটি ধরা পড়েছে তা বিবৃত কর।

২.
ঝকঝকে নীলাকাশ সোনা ঢালা রোদ্দুর
ভোর হতে 'কাঁই না না' আর সানায়ের সুর

—প্রথম পঙ্‌ক্তিটি কিসের প্রতীক ? 'কাঁই না না ও সানায়ের সুরে' কি বোঝাচ্ছে ? পঙক্তি দুটির ভাব পরিস্ফুট কর।

৩.
প্রতিবার মন থেকে ঠিক গড়ে ছবিখানি
পুরুতের চেয়ে আমি তাই তারে বড় মানি।

—কে ছবিখানি গড়ে ? 'মন থেকে' বলতে কি বোঝাচ্ছে ? পুরুতের কাজ কি ? যে ছবি গড়ে তাকে বক্তা বেশী মানে কেন ?

৪. 'আর পূজো সত্যি রে!'—কোন্ পূজো ? পূজো বলে চেনা গেল কিসে ? গতবারের পূজোয় কি হয়েছিল তার ?

৫. 'কতবার সরে এসে দেখে মার মুখখানা'—কে মায়ের মুখ দেখে ? সে কি করে ব'লে বক্তার অভিযোগ ?

৬. 'পূজো মানে শেষ করা তার চেয়ে গড়া বেশ'—বক্তার এরূপ আকাঙ্ক্ষা কেন ? সে কি চায় ? পূজো কদিন চলে এবং প্রতিমা কিভাবে সাজানো হয় ?

৭.
আগে মার মুখ দেখে ভরে যায় অন্তর
তারপর পূজো পাট যত কিছু মন্তর।

—উক্তিটির মূল অর্থটি পরিস্ফুট কর। কবি কে ? কবিতাটি কি ?

৮. নিম্নের শব্দগুলির সাধুরূপ দাও : রোদ্দুর, পুজো, সিঁদুর, স'রে, থেকে, পুরুত, পরশু, চিত্তির, আশ, মন্তর, আগে।

The emotional attachment to the



দিদিহারা

—যতীন্দ্র মোহন বাগচী

[কবিতাটি করুণ রসাত্মক। দিদির জন্য ছোট ভাইএর অন্তরের করুণ আর্তনাদই কবিতাটির বিষয় বস্তু।]

বাঁশ বাগানের মাথার উপর চাঁদ উঠেছে ওই ;
মাগো, আমার শোলোক-বলা কাজ্‌লা দিদি কই ?
পুকুর ধারে লেবুর তলে থোকায় থোকায় জোনাক্ জ্বলে-
ফুলের গন্ধে ঘুম আসে না, তাই তো জেগে রই ;
মাগো, আমার কোলের কাছে কাজ্‌লা দিদি কই ?

বল্ মা দিদি কোথায় গেছে, আসবে আবার কবে ?
কাল যে আমার নতুন ঘরে পুতুল-বিয়ে হবে !
দিদির মত ফাঁকি দিয়ে আমিও যদি লুকাই গিয়ে
তুমি তখন একলা ঘরে কেমন ক'রে রবে ?
আমিও নাই, দিদিও নাই, কেমন মজা হবে !

ভুঁই-চাঁপাতে ভরে গেছে শিউলী গাছের তল,
মাড়াস্ নে মা—পুকুর থেকে আন্‌বি যখন জল।
ডালিম গাছের ডালের ফাঁকে বুলবুলিটি লুকিয়ে থাকে,
উড়িয়ে তুমি দিও না মা, ছিঁড়তে গিয়ে ফল ;
দিদি এসে শুনবে যখন বল্‌বে কি মা বল !

বাঁশ বাগানের মাথার উপর চাঁদ উঠেছে ওই ;
এমন্ সময় মাগো, আমার কাজ্‌লা দিদি কই ?
বেড়ার ধারে পুকুর-পাড়ে ডাকছে ঝিঁ ঝিঁ ঝোপে ঝাড়ে
নাই সে পাশে, ঘুম কি আসে ? তাই তো জেগে রই।
রাতি হ'ল যে মা গো, আমার কাজ্‌লা দিদি কই ?

॥ অনুশীলনী ॥

১. 'দিদিহারা' কবিতায় যে করুণ রসটি উৎসারিত হয়েছে তা বিবৃত কর।

২. কবিতাটিতে প্রকৃতির কোন্ কোন্ চিত্র বর্ণিত হয়েছে তা উল্লেখ কর।

৩. 'তাই তো জেগে রই'—কে জেগে আছে ? কেন ? জেগে জেগে কি দেখছে সে ?

৪. 'আমিও নাই, দিদিও নাই, কেমন মজা হবে'—কে কাকে বলেছে ? কি বলেছে ? বক্তার কাছে এটা মজা কেন ?

৫. 'দিদি এসে শুনবে যখন বল্‌বে কি মা বল'—দিদি এসে কি শুনবে ? মাকে কি কি করতে নিষেধ করেছে ? বক্তা কি দেখেছে ?

৬. 'নাই সে পাশে, ঘুম কি আসে'—কে পাশে নেই ? কার ঘুম আসছে না এবং কেন ? সে কি দেখছে ও শুনছে ?

৭. দিদির মত ফাঁকি দিয়ে আমিও যদি লুকাই গিয়ে
তুমি তখন একলা ঘরে কেমন করে উঠে ?

—উদ্ধৃতিটি কোন্ কবিতা থেকে নেওয়া হয়েছে ? কবি কে ? এখানে বক্তার মনের কোন্ ভাব ফুটে উঠেছে বুঝিয়ে দাও। মায়ের হৃদয়ে এই কথাগুলি কেমনভাবে বাজবে ?

৮. গদ্যরূপ দাও :

শোলোক; জোনাক্, রই, রবে, রাতি।

---

৩ Love and longings for the elder-sister



কৃতজ্ঞতা

—কুমুদরঞ্জন মল্লিক

[গ্রাম বাঙলার কবি কুমুদরঞ্জন এই কবিতায় মানুষের স্বভাবের বিশেষ একটি দিকের কথা বলেছেন। কৃতজ্ঞতা বোধ মানুষেরই থাকা উচিত। উপকারীর উপকার স্বীকার করার মধ্যেই প্রকৃত মনুষ্যত্ব বিরাজ করে।]

একদা পৌষের প্রাতে দুঃখে জীর্ণ শীর্ণকায়,
চলেছে পথিক এক, শীতে ঠেকে পায় পায়।
হেরিয়া কম্পিত পদ, হেরি ম্লান মুখ খান,
চোখেতে আসিল জল, কাঁদিয়া উঠিল প্রাণ।
ছেঁড়া বালাপোষখানি দিনু ডাকি' হাতে তাঁ'র,
গায়েতে জড়া'লো সে'টি বহে দর দর ধার।
'যে শান্তি দিল এ দীনে',—বলে জুড়ি' দুটি কর,
যুগে যুগে সুখ শান্তি দিয়ো তাঁরে, হে ঈশ্বর!
যে করিল অভাগার এত শীত নিবারণ,
তাঁর দুঃখ-ব্যথা যেন ঘুচাইয়ো ভগবন্!'
কে বলে কৃতঘ্ন নরে? নহে তাহা সত্য কথা,
হায়, কত তুচ্ছদানে কি গভীর কৃতজ্ঞতা!

॥ অনুশীলনী ॥

১. 'কৃতজ্ঞতা বোধ মানুষের থাকা উচিত'—এই অর্থটি কবিতার মধ্যে কতখানি অনুসৃত হয়েছে আলোচনা করে দেখাও।

২. 'কৃতজ্ঞতা' কবিতায় কবি মানুষের স্বভাবের যে বিশেষ দিকটির কথা বলেছেন তা লিখ।

৩. 'চলেছে পথিক এক'—পথিক কখন চলেছে? তার চেহারা কেমন? কী কষ্ট হচ্ছে তার?

৪. 'কাঁদিয়া উঠিল প্রাণ'—কার প্রাণ কেঁদে উঠল? কি দেখে সে কাঁদল?

৫. 'যে শান্তি দিলে এ দীনে'—'দীন' কে? সে কিসে শান্তি পেল? শান্তি পেয়ে সে কী বলল?

৬. 'তাঁর দুঃখ-ব্যথা যেন ঘুচাইয়ো ভগবন্!'—কার দুঃখ-ব্যথা ঘুচিয়ে দেবার জন্য প্রার্থনা করেছে এবং কেন? এর মধ্য দিয়ে বক্তার মনের কোন্ ভাবটি ফুটে উঠেছে?

৭. 'কে বলে কৃতঘ্ন নরে?'—এ কথা বলা হল কেন? কি দেখে এরূপ প্রশ্ন করা হয়েছে? প্রশ্নটির মধ্যে সত্যতা কতটা আছে? 'কৃতঘ্ন' শব্দের অর্থ কি?

৮. 'কত তুচ্ছদানে কি গভীর কৃতজ্ঞতা'—কোন্ কবিতায় আছে? কবি কে? তুচ্ছদানটি কি? দানটিকে তুচ্ছ বলা হয়েছে কেন? এই দানে কার কিরূপ উপকার হয়েছে? সে কিরূপ কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করল?

৯. গদ্য রূপ দাও:

হেরিয়া, হেরি, দিনু, ডাকি, গায়েতে, জুড়ি, ভগবন্।

১০. পদ পরিবর্তন কর:

পৌষ, জীর্ণ, শীর্ণ, শীত, ম্লান, দীন, ঈশ্বর, দুঃখ, ব্যথা, নিবারণ, কৃতঘ্ন, গভীর, কৃতজ্ঞতা।

Men are not generally ungrateful.

সর্বনাশী মেঘনা



— হুমায়ুন কবীর

[পূর্ব বাঙলার নদী মেঘনা বর্ষাকালে প্রচণ্ড রূপ ধারণ করে। নামে ঢল। দুই প্রান্ত হয় প্লাবিত। এই নদীর ঢলে আমিনা নামক এক বালিকার শোচনীয় মৃত্যুর চিত্র কবি এখানে এঁকেছেন।]

শোন্ মা আমিনা, রেখে দেরে কাজ, ত্বরা ক'রে মাঠে চল,
এল মেঘনায় জোয়ারের বেলা, এখনই নামিবে ঢল্।
নদীর কিনারা ঘন ঘাসে ভরা
মাঠ থেকে গরু নিয়ে আয় ত্বরা
করিস না দেরি—আসিয়া পড়িবে সহসা অথই জল।
মাঠ থেকে গরু নিয়ে আয় ত্বরা, মেঘনায় নামে ঢল্।

এখনো যে মেয়ে আসে নাই ফিরে? দুপুর যে বয়ে যায়।
ভরা জোয়ারের জল কূলে কূলে উথলায় উছলায়।
নদীর কিনারে জলে একাকার,
যে দিকে তাকাই অথই পাথার
দেখ্‌তো গোয়ালে গরুগুলো রেখে গিয়েছে কি ও পাড়ায়?
এখনও সে কিরে আসে নাই ফিরে? দুপুর যে বয়ে যায়।
ভর বেলা গেল, ভাটা পড়ে আসে আঁধার জুটিছে আসি,
এখনও তবুও এল না ফিরিয়া আমিনা সর্বনাশী।

দেখ্, দেখ্, দূরে মাঝ-দরিয়ায়
কালো চুল যেন ওই দেখা যায়।

কাহার শাড়ির আঁচল-আভাস সহসা উঠিছে ভাসি,
আমিনারে মোর নিল কি টানিয়া মেঘনা সর্বনাশী ?

॥ অনুশীলনী ॥

১. 'সর্বনাশী মেঘনা' কবিতায় মেঘনার সর্বনাশী রূপ কিভাবে ফুটে উঠেছে তা বিবৃত কর।

২. 'আমিনা' কোন্ নদীর ধারে গিয়েছিল ? তার শোচনীয় মৃত্যুর করুণ দৃশ্যটি ব্যক্ত কর।

৩. 'ত্বরা করে মাঠে চল,—কাকে মাঠে যেতে বলা হয়েছে ? মাঠে যেতে এত তাড়া কেন ? মাঠে কী ঘটতে চলেছে ?

৪. 'দুপুর যে বয়ে যায়'—দুপুর বয়ে যাওয়ার কথা বলার কারণটি উল্লেখ কর। কোন্ কবিতায় এই উক্তিটি আছে ?

৫. 'আমিনারে মোর নিল কি টানিয়া মেঘনা সর্বনাশী ?'—কার এই আক্ষেপ ? আমিনাকে কোথায় কেন টেনে নিয়েছে ? মেঘনাকে 'সর্বনাশী' বলা হয়েছে কেন ?

৬. 'আসিয়া পড়িবে সহসা অথই জল'— কার জল এসে পড়বে ? তা সহসা আসবে কেন ? এই জল আনা নিয়ে বক্তার ভয়টা কিসের ?

৭. নদীর কিনারে জলে একাকার,
যে দিকে তাকাই অথই পাথার

—কোন্ কবিতার অংশ ? কবি কে ? কি দেখে এই কথা বলা হয়েছে ? উক্তিটির অর্থ পরিস্ফুট কর।

৮. বাক্য রচনা কর :

ত্বরা, সহসা, একাকার, আঁধার, সর্বনাশী, আভাস।

৯. অর্থ লিখ :

ত্বরা, কূলে, একাকার, পাথার, ভর বেলা, দরিয়া, আভাস।

the story of the tragic drowning of a poor peasant girl.

স্বাধীনতা



—গোপাল ভৌমিক

[দেশ স্বাধীন হয়েছে। কিন্তু সেই স্বাধীনতা ছোট ছেলেটি কতখানি ভোগ করতে পেরেছে তারই চিত্র আঁকা হয়েছে কবিতাটিতে।]

বাবা রোজ বলে স্বাধীন হয়েছে হয়েছি কি ছাই তাতে ?
বুঝতে পারি না কার কি যে হল কে পেল স্বর্গ হাতে!
আমরা তো দেখি সেই পরাধীন যেমন ছিলাম আগে—
সকাল সন্ধ্যা তাই নিয়ে কাটে উদ্বেগে ভয়ে রাগে।
মনকে যতই বোঝাই না কেন কিছুতে আসে না বাগে—
দিনের স্বপ্ন রাত্রির ঘুম চোখের পলকে ভাগে।
পাঁচু ভালবাসে পুতুল খেলতে হাবু ভালবাসে গান—
ফুটবল হাতে মাঠমুখী সদা অবুঝ গবুর প্রাণ।
আমার কথাটি নাই বললাম—প্রাণে লাটাই ছেড়ে
মনে হয় ঘুরি দিন রাত্তির আকাশের আলো কেড়ে।
কিন্তু সে সব স্বপ্ন কেবল স্বপ্নই থেকে যায়—
ঘরের সীমানা পেরোলেই দেখি শাসন পিছনে ধায়।
বাবা রোজ যায় হাটে ও বাজারে অফিসে গড়ের মাঠে—
খায় শোয় সব ইচ্ছা মতন খুসী মত কেনে কাটে!
যত দোষ সব আমাদের বেলা পায়ে পায়ে রশি এঁটে—
লেখা-পড়া-খেলা ভাগাভাগি করে সমানে দিয়েছে বেঁটে।
বাবা তবু বলে স্বাধীন হয়েছি পরাধীন তবে কারা ?
এর নাম যদি হয় স্বাধীনতা তবেই গিয়েছি মারা!

॥ অনুশীলনী ॥

১. 'স্বাধীনতা' কবিতায় স্বাধীনতার যে কথাটি ব্যক্ত হয়েছে তা বিবৃত কর।

২. 'আমরা তো দেখি সেই পরাধীন যেমন ছিলাম আগে'—'আমরা' কারা? কিসের পরাধীনতা? 'যেমন ছিলাম আগে' বলতে কোন্ অর্থ নির্দেশ করছে?

৩. 'আমার কথাটি নাই বললাম'—কাদের কথা কে বলেছে? সে নিজে কী করতে চায়? সে সব কিছুকেই স্বপ্ন বলে ভাবে কেন?

৪. 'বাবা তবু বলে স্বাধীন হয়েছি'—বাবার মতে স্বাধীনতা কোন্‌টি? বাবা কিভাবে স্বাধীনতা ভোগ করেন? উক্তিটির মধ্য দিয়ে ছেলের কি অভিযোগ ফুটে উঠেছে?

৫. 'এর নাম যদি হয় স্বাধীনতা তবেই গিয়েছি মারা'—এ স্বাধীনতা কোন্ স্বাধীনতা? বক্তা কিরূপ স্বাধীনতা ভোগ করতে চায়? কোন্ কোন্ দিক থেকে সে স্বাধীনতা পায়নি?

৬. 'দিনের স্বপ্ন রাত্রির ঘুম চোখের পলকে ভাগে'—উক্তিটি কার? কবি ও কবিতার নামটি লিখ। মূল অর্থটি বুঝিয়ে বল।

৭. সে সব স্বপ্নই কেবল স্বপ্নই থেকে যায়—উচ্ছ্বতিটি কোন্ কবিতার? কবির নাম লেখ। কোন্‌গুলোকে স্বপ্ন বলা হচ্ছে এবং কেন? কি কি কারণে বক্তার স্বপ্ন স্বপ্নই থেকে যাচ্ছে?

৮. পদ পরিবর্তন কর :

স্বাধীন, স্বর্গ, হাট, মাঠ, সন্ধ্যা, পরাধীন, আকাশ।

৯. অর্থ লিখ :

রোজ, স্বাধীন, পরাধীন, উদ্বেগ, পলক, মাঠমুখী, স্বপ্ন, সীমানা, রশি, ভাগাভাগি।

To a child, the meaning of independence is different.

পল্লীজননী



—জসিমউদ্দিন

[জসিমউদ্দিন পূর্ব-পাকিস্থানের একজন লব্ধপ্রতিষ্ঠ কবি। তাঁর কবিতায় যে পল্লীবাংলার স্নিগ্ধ চিত্র ফুটে উঠে, তারই উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত এই কবিতাটি। এই কবিতাটিতে মাতৃহৃদয়ের ব্যাকুলতার চিত্রই ফুটে উঠছে।]

রাত থম্ থম শব্দ নিঝুম, ঘনঘোর আঁধিয়ার,
নিশ্বাস পড়ে, তাও শোনা যায় নিঃসাড় চারিধার।
ভন্ ভন্ ভন্ জমাট বেঁধেছে বুনো মশকের গান,
এঁধো ডোবা হতে বহিছে বাতাস পচানো পাতার ঘ্রাণ!
ছোট কুঁড়ে ঘর বেড়ার ফাঁকেতে আসিছে শীতল বায়ু,
শিয়রে বসিয়া মনে মনে মাতা গণিছে ছেলের আয়ু।
নামাজের ঘরে মোমবাতি মানে, দরগায় মানে দান,
'ছেলেরে আমার ভাল করে দাও'—কাঁদে জননার প্রাণ।
'ভাল ক'রে দাও আল্লা রছুল, ভাল ক'রে দাও পীর',
কহিতে কহিতে বুকখানি ভাসে বহিয়া নয়ন-নীর।
যে কথা ভাবিতে পরাণ শিহরে তাই ভাসে হিয়া-কোণে,
'বালাই, বালাই ভাল হবে, বাছা'—স্বপ্নের জাল বোনে।
কত কথা আজ মনে পড়ে, তার গরীবের সংসারে,
ছোটখাটো কত বায়না ছেলের পারে নাই মিটাবারে।
ঘরের চালেতে ভুতুম ডাকিছে অকল্যাণ এ সুর,
মরণের দূত এল বুঝি হায়, হাঁকে মায়—'দূর—দূর'।

ফেরে ভন্ ভন্ মশা দলে দলে, বুড়ো পাতা ঝরে বনে,
ফোঁটায় ফোঁটায় পাতা-চোঁয়া জল ঝরিছে তাহার মনে।
পার্শ্বে কাঁপিছে মাটির প্রদীপ, এখনি নিভিবে বুঝি,
ফুরায়ে এসেছে তৈল তাহার আঁধারের সাথে যুঝি'।

॥ অনুশীলনী ॥

১. 'পল্লীজননী' কবিতায় মায়ের হৃদয়ের যে ব্যাকুলতার সুরটি ধ্বনিত হয়েছে তার পরিচয় দাও।

২. "ছেলেরে আমার ভাল করে দাও"—উক্তিটির মধ্যে মায়ের হৃদয়ের যে আকুতি প্রকাশ পেয়েছে তা ব্যাখ্যা কর।

৩. 'মাতা গণিছে ছেলের আয়ু'—কোন্ সময় মা ছেলের আয়ুর কথা ভাবছে? ছেলের জন্য মা কার কাছে কী প্রার্থনা করেছে?

৪. 'কত কথা আজ মনে পড়ে'—কার? কি কথা মনে পড়ে? তার মনে ভয়ের সৃষ্টি হয় কিসে?

৫. 'ফুরায়ে এসেছে তৈল তাহার'—কিসের তেল ফুরিয়ে এসেছে? উক্তিটিতে যে দ্ব্যর্থক তা ব্যাখ্যা করে বুঝিয়ে দাও।

৬. কবিতাটিতে প্রকৃতির যে চিত্রটি আছে তা তোমার নিজের ভাষায় প্রকাশ কর।

৭ 'কাঁদে জননীর প্রাণ'—কেন জননীর প্রাণ কাঁদছে? কোন্ সময় জননীর প্রাণ কেঁদে ওঠে? এর জননী কি করতে চেয়েছে?

৮. 'মরণের দূত এল বুঝি হায়'—কার মনের কথা? কাকে মরণের দূত বলা হয়েছে? তাকে মরণের দূত বলা হোল কেন? মায়ের মনে এরকম ভাবনা আসে কেন? মরণের দূতকে মা কি করলেন? 'মরণের দূত' বলতে কি বোঝায়?

৯. বাক্য রচনা কর:
নিঝুম, ঘনঘোর, নিঃসাড়, স্বপ্নের জাল, অকল্যাণ, ভন্ ভন্, আঁধার।

The anxiety of the village mother for her dying child



—সুকান্ত ভট্টাচার্য্য

[কবিতাটি নবীন কবির একটি অভিনব সৃষ্টি। নূতন দিন আসছে, নূতন দিনের নূতন আলোর আহ্বান জানাচ্ছেন কবি এই কবিতাটিতে।]

আমাদের ডাক এসেছে এবার পথ চলতে হবে,
ডাক দিয়েছে গগন রবি ঘরের কোণে কেই বা রবে।
ডাক এসেছে চলতে হবে আজ সকালে
বিশ্বপথে সবার সাথে সমান তালে
পথের সাথী আমরা রবির সাঁজ-সকালে চলরে সবে॥

ঘুম থেকে আজ সকালবেলা ওঠরে
ডাক দিল কে পথের পানে ছোটরে,
পিছন পানে তাকাসনি আজ চল সুমুখে
জয়ের বাণী নূতন প্রাতে বল ও'মুখে
তোদের চোখে সোনার আলো সফল হয়ে ফুটবে কবে॥

॥ **অনুশীলনী** ॥

১. কবিতাটির মূল ভাবটি পরিস্ফুট কর।

২. কবিতাটি কাদের প্রতি কিসের আহ্বানের কথা শুনিয়েছেন তা ব্যক্ত কর।

৩. 'আমাদের ডাক এসেছে'—কিসের ডাক এসেছে? কে ডাক দিয়েছে? কেন ডাক দিয়েছে?

৪. বাক্য রচনা কর:

সুখ, জয়, নূতন, আলো, ঘুম, সফল, বিশ্বপথে, বাণী, সাঁজ-সকালে।

The call of new light, new ideas in
the new days.

সাহিত্য-বিচিত্রা

গদ্যাংশ

শিল্প বানিজ্য ও সমাজ



-ঈশ্বর চন্দ্র বিদ্যাসাগর

[ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর বাংলা গদ্যের জনক। তাঁর হাতেই হয়েছে বাংলা গদ্যের প্রাণ প্রতিষ্ঠা। এই রচনাটি সেরূপ গদ্য রচনার একটি নমুনা মাত্র। এই রচনাটিতে লেখক অতি সরল ভাষায় বোঝাতে চেয়েছেন যে সমাজের শ্রীবৃদ্ধির জন্য নানা শিল্প ও ব্যবসা-বাণিজ্য থাকা প্রয়োজন, নানা ধরণের শিল্পী ও ব্যবসায়ী না থাকলে সমাজের উন্নতি নেই।]

লোকে কৃষিকার্য প্রভৃতির দ্বারা যে সকল বস্তু লাভ করে, তাহাদিগের অধিকাংশ নানা উপায়ে ব্যবহারের উপযোগী করিয়া লইতে হয়। কার্পাস কৃষি-কর্ম দ্বারা উৎপন্ন হয়; কিন্তু তুলা হইতে সূতা এবং সূতা হইতে বস্ত্র প্রস্তুত করিতে বিশেষ পরিশ্রম ও কৌশল আবশ্যক হইয়া থাকে। লৌহ আকরে জন্মে; কিন্তু লৌহ হইতে ইস্পাত এবং সেই ইস্পাত হইতে ছুরি, কাঁচি প্রভৃতি অস্ত্র প্রস্তুত করিতে, পুনর্বার পরিশ্রম ও কৌশল আবশ্যক হয়। এইভাবে বিশেষ বুদ্ধি প্রয়োগে, ক্ষুদ্র-বৃহৎ যন্ত্রের সহায়তায়, সামগ্রী প্রস্তুত করাকে শিল্পকার্য বলে।

কর্মকার, কুম্ভকার, তন্তুবায় প্রভৃতিকে শিল্পী বলা হয়। উহারা না থাকিলে, আমাদিগের একদিনের জন্যও সুখে বাস করা সুকঠিন হইত। তন্তুবায় না থাকিলে বস্ত্রাদি মিলিত না; কুম্ভকার না থাকিলে রন্ধনকার্য চলিত না; কর্মকার না থাকিলে কি কুম্ভকার কি তন্তুবায় কেহই

অস্ত্রাদির অভাবে স্ব স্ব শিল্পকার্য চালাইতে পারিত না। এজন্য পৃথিবীর সর্বস্থানেই শিল্পীদিগের যথেষ্ট আদর আছে। যে দেশে শিল্পকর্মের যত উন্নতি, সে দেশ তত সমৃদ্ধিশালী হয়। ইংলণ্ড, জার্মানী, জাপান, আমেরিকা প্রভৃতি দেশে যে এত ধন ও ঐশ্বর্য, শিল্পকর্মের উন্নতি তাহার প্রধানতম কারণ।

কৃষকেরা যে শস্যাদি উৎপাদন করে এবং শিল্পীরা যে শিল্পদ্রব্য প্রস্তুত করে, তাহা সকলের হস্তগত হওয়া আবশ্যক। এজন্য কোনও লোক কৃষক ও শিল্পীদিগের নিকট হইতে এই সকল দ্রব্যাদি ক্রয় করিয়া এক একটি নির্দিষ্ট স্থানে লইয়া গিয়া বিক্রয় করিয়া থাকে। ঐ স্থানকে বিপণি বা বাজার কহে এবং ঐ সকল লোককে বণিক বা ব্যবসায়ী বলিয়া থাকে। কৃষক ও শিল্পী না থাকিলে যেরূপ দ্রব্যাদি প্রস্তুত হইত না, সেইরূপ ব্যবসায়ী না থাকিলে সকলে সুবিধামত দ্রব্যাদি ক্রয় করিতে পাইত না।

সকল দেশে সর্বপ্রকার প্রয়োজনীয় দ্রব্য জন্মে না, বা প্রস্তুত করিবার সুবিধা হয় না। কোনও কোনও দেশ ধান্যের বিশেষ উপযোগী; তথায় অল্প পরিশ্রমেই অপর্যাপ্ত ধান্য উৎপন্ন হয়। কোনও কোনও দেশের ভূমিতে তত ধান্য জন্মে না; কিন্তু কার্পাস চাষ করিলে যথেষ্ট লাভ হইতে পারে। কোনও কোনও দেশে খনি আছে; কিন্তু অপর কোনও দ্রব্য ভাল জন্মে না। কেবল কৃষিজাত দ্রব্যাদি নহে, শিল্প সামগ্রীও সকল দেশে সর্বপ্রকারে ও সকলভাবে উৎপন্ন হয় না। এই সকল দেশের লোক স্ব স্ব দেশজাত দ্রব্যাদির বিনিময় করিলে, সকলেই নিজ নিজ আবশ্যক সামগ্রী লাভ করিয়া, সুখে ও স্বচ্ছন্দে থাকিতে পারে। এক দেশের সহিত অন্যদেশের এইরূপ বিনিময়ের নাম বাণিজ্য।

বাণিজ্যের গুণে লোকের সুখ ও স্বচ্ছন্দতা যে কত বৃদ্ধি পাইয়াছে, তাহার ইয়ত্তা করা যায় না। বাঙ্গালা দেশের ভূমি অতিশয় উর্বরা; এখানে অধিবাসীদিগের যে পরিমাণ খাদ্য সামগ্রী আবশ্যক, তদপেক্ষা

অধিক জন্মিয়া থাকে। আমরা এই খাদ্য সামগ্রীর কিয়দংশের বিনিময়ে, কোনও কোনও আবশ্যকীয় বস্তু অপরাপর দেশ হইতে প্রাপ্ত হই।

কৃষক, শিল্পী ও বণিক—এই তিন শ্রেণীর লোকের সাহায্য আমাদিগের নিতান্ত আবশ্যক। কিন্তু উহাদিগের দ্বারা কখনই মনুষ্য জীবনের সমুদয় অভাবের মোচন হয় না। জ্ঞান ও ধর্মের উপার্জন, রোগের চিকিৎসা প্রভৃতি বিষয়ে অন্যবিধ লোকের সাহায্য লইতে হয়। এইরূপে নানা শ্রেণীর লোক পরস্পরের সাহায্যার্থে নিযুক্ত রহিয়াছে। এই সকল বিভিন্ন গুণ ও শ্রেণীর লোকের সমাবেশ দ্বারা সমাজ গঠিত হয়।

সমাজ না থাকিলে মানুষ কোনও বিষয়ের, বিশেষতঃ জ্ঞান ও ধর্মের, এইরূপ উন্নতি করিতে পারিত না। পশু পক্ষীদিগের মানবের ন্যায় সমাজ নাই; সুতরাং তাহাদের কোনও উন্নতি নাই। কেবল আহার অন্বেষণ করিতেই তাহাদের সমস্ত সময় কাটিয়া যায়। কিন্তু সমাজ থাকাতে মনুষ্যেরা আহারাদি সংগ্রহ ব্যতীত জ্ঞান ও ধর্মের উপার্জন করিবারও যথেষ্ট সময় পায়।

সমাজে ভাল মন্দ নানা প্রকার লোক বাস করে। একদিকে, জ্ঞানী ও ধার্মিক লোকেরা সুশিক্ষা ও সৎপরামর্শ দ্বারা সকলকেই সুপথে লইয়া যাইবার চেষ্টা করেন, এবং দরিদ্র, পীড়িত ও বিপন্ন ব্যক্তির সাহায্য করিয়া সমাজের অশেষ উপকার করেন; অপরদিকে চোর, ডাকাইত, প্রবঞ্চক প্রভৃতি দুশ্চরিত্র ব্যক্তিগণ, পরের দ্রব্য ছলে-বলে-কৌশলে অপহরণ করিয়া, তাহাদের অনিষ্ট সাধনের চেষ্টা করে। এই সকল লোককে দমন করিতে না পারিলে, অল্পকাল মধ্যেই সমাজ বিশৃঙ্খল হইয়া পড়ে।

॥ অনুশীলনী ॥

১. 'শিল্প' ও 'বাণিজ্য' এই কথা দুটির মধ্যে কি তাৎপর্য ফুটে উঠেছে? কৃষি, শিল্প ও বাণিজ্য দ্বারা সমাজ কিভাবে গঠিত হয়?

২. 'উহারা' না থাকিলে আমাদের একদিনের জন্যও সুখে বাস করা সুকঠিন হইত'—'উহারা' কারা? ওদের ছাড়া সুখে বাস করা যেত না কেন?

৩. সমাজ কেন বাণিজ্যের উপর নির্ভরশীল? বাণিজ্য কিভাবে সমাজকে সাহায্য করতে পারে?

৪. শিল্পী কোন্ কোন্ দিক থেকে সমাজকে উন্নতির পথে নিয়ে যায়? কৃষকের প্রয়োজন কেন?

৫. সমাজ কখন বিশৃঙ্খল হয়ে পড়ে? এই বিশৃঙ্খলা রোধ করবার উপায়গুলি বর্ণনা কর।

৬. সমাজ থাকবার ফলেই মানুষের উন্নতি হয়েছে—মন্তব্যটি ব্যাখ্যা কর।

৭. "উহারা না থাকিলে"—কারা? তারা কি কি কাজ করে?

৮. "সমাজে ভাল-মন্দ নানা প্রকার লোক বাস করে"—কারা ভাল, কারা মন্দ? তারা কি ভাবে উপকার ও অপকার করে?

৯. 'এক দেশের সহিত অন্য দেশের এইরূপ বিনিময়ের নাম বাণিজ্য'—'বিনিময়' বলতে কি বোঝায়? কিরূপ বিনিময় হয়ে থাকে তা দৃষ্টান্ত দিয়ে বোঝাও।

১০. 'অল্পকাল মধ্যেই সমাজ বিশৃঙ্খল হইয়া পড়ে'—কি কারণে সমাজ বিশৃঙ্খল হয়ে পড়ে? সমাজের উপকার হয় কিসের এবং কাদের দ্বারা?

১১. 'কৃষক ও শিল্পী না থাকিলে যেরূপ দ্রব্যাদি প্রস্তুত হইত না।' সেইরূপ ব্যবসায়ী না থাকিলে সকলে সুবিধামত দ্রব্যাদি ক্রয় করিতে পাইত না'—কোন্ প্রবন্ধে এটি আছে? লেখক কে? উক্তিটির মধ্য দিয়ে লেখক যে বক্তব্য তুলে ধরতে চেয়েছেন তা বুঝিয়ে দাও।

১২. নিম্নলিখিত শব্দগুলির সাহায্যে বাক্য গঠন কর:
পরিশ্রম, সুকঠিন, হস্তগত, অপর্যাপ্ত, তদপেক্ষা, সমুদয়, বিনিময়, কৃষি-জাত, অন্বেষণ, প্রবঞ্চক, বিশৃঙ্খল, ইয়ত্তা।

১৩. সন্ধি বিচ্ছেদ কর:
পুনর্বার, পর্যাপ্ত, স্বচ্ছন্দ, তদপেক্ষা, কিয়দংশ, অপরাপর, উন্নতি, অন্বেষণ, দুশ্চরিত্র, যথেষ্ট।

১৪. শূন্যস্থান পূরণ কর:
বাণিজ্যের——লোকের সুখ ও——যে কত বৃদ্ধি পাইয়াছে, তাহার——করা যায় না। কেবল——অন্বেষণ করিতেই——সমস্ত সময়—যায়।

Contributions of social fields like weavers smiths, merchants, artisans etc.



মাতৃমূর্তি

-বঙ্কিম চন্দ্র চট্টোপাধ্যায়

[বঙ্কিমচন্দ্রের একটি বিখ্যাত উপন্যাস 'আনন্দমঠ'। এই 'আনন্দমঠ' থেকে এই অংশটি নেওয়া হয়েছে। 'সকল ধর্মের সার স্বদেশপ্রীতি'—এই সত্যের উপরই উপন্যাসটি প্রতিষ্ঠিত। এই অংশে দেশ মাতৃকার অতীত, বর্তমান ও ভবিষ্যতের একটি রূপ অঙ্কিত হয়েছে এবং বলা হচ্ছে স্বাধীনতা আগতপ্রায়।]

ব্রহ্মচারী অগ্রে অগ্রে, মহেন্দ্র পশ্চাৎ পশ্চাৎ দেবালয়ের অভ্যন্তরে প্রবেশ করিলেন। প্রবেশ করিয়া মহেন্দ্র দেখিল, অতি বিস্তৃত, অতি উচ্চ প্রকোষ্ঠ। তখনও সেই বিশাল কক্ষায় প্রায় অন্ধকার। ঘরের মধ্যে কি আছে মহেন্দ্র প্রথমে তাহা দেখিতে পাইল না—দেখিতে দেখিতে, ক্রমে দেখিতে পাইল, এক প্রকাণ্ড চতুর্ভুজমূর্তি, শঙ্খচক্রগদা-পদ্মধারী, সম্মুখে সুদর্শনচক্র ঘূর্ণ্যমানপ্রায় স্থাপিত। মধুকৈটভস্বরূপ দুইটি প্রকাণ্ড ছিন্নমস্ত মূর্তি রুধিরপ্লাবিতবৎ চিত্রিত হইয়া সম্মুখে রহিয়াছে। বামে লক্ষ্মী ভয়ত্রস্তার ন্যায় দাঁড়াইয়া আছেন। দক্ষিণে সরস্বতী, পুস্তক, বাদ্যযন্ত্র, মূর্তিমান রাগরাগিণী প্রভৃতি পরিবেষ্টিত হইয়া দাঁড়াইয়া আছেন। বিষ্ণুর অঙ্কোপরি এক মোহিনী মূর্তি—লক্ষ্মী ও সরস্বতীর অধিক সুন্দরী, লক্ষ্মী সরস্বতীর অধিক ঐশ্বর্য্যান্বিতা। ব্রহ্মচারী অতি গম্ভীর, অতি ভীত স্বরে মহেন্দ্রকে জিজ্ঞাসা করিলেন, 'সকল দেখিতে পাইতেছ?' মহেন্দ্র বলিল, 'পাইতেছি।'

ব্রহ্মা। বিষ্ণুর কোলে কি আছে দেখিয়াছ?

মহে। দেখিয়াছি। কে উনি?

ব্রহ্মা। মা।

মহে। মা কে?

ব্রহ্মচারী বলিলেন, 'আমরা যাঁর সন্তান।'

মহেন্দ্র। কে তিনি?

ব্রহ্ম। সময়ে চিনিবে। বল বন্দে মাতরম্। এখন চল, দেখিবে চল।

তখন ব্রহ্মচারী মহেন্দ্রকে কক্ষান্তরে লইয়া গেলেন। সেখানে মহেন্দ্র দেখিলেন এক অপরূপ জগদ্ধাত্রী মূর্তি।

মহেন্দ্র জিজ্ঞাসা করিলেন, 'ইনি কে?'

ব্র। মা—যা ছিলেন।

ম। সে কি?

ব্র। ইনি কুঞ্জর-কেশরী প্রভৃতি বন্য পশুসকল পদতলে দলিত করিয়া, বন্য পশুর আবাস স্থানে আপনার পদ্মাসন স্থাপিত করিয়াছিলেন। ইনি সর্বালঙ্কার-পরিভূষিতা হাস্যময়ী সুন্দরী ছিলেন। ইহাকে প্রণাম কর।

মহেন্দ্র ভক্তিভাবে জগদ্ধাত্রীরূপিণী মাতৃভূমিকে প্রণাম করিলে পর, ব্রহ্মচারী তাঁহাকে এক অন্ধকার সুরঙ্গ দেখাইয়া বলিলেন, 'এই পথে আইস।' ব্রহ্মচারী স্বয়ং আগে চলিলেন। মহেন্দ্র সভয়ে পাছু পাছু চলিলেন। ভূগর্ভস্থ এক অন্ধকার প্রকোষ্ঠে কোথা হইতে সামান্য আলো আসিতেছিল। সেই ক্ষীণালোকে এক কালীমূর্তি দেখিতে পাইলেন।

ব্রহ্মচারী বলিলেন, 'দেখ, মা যা হইয়াছেন।'

মহেন্দ্র সভয়ে বলিল, 'কালী'।

ব্র। কালী—অন্ধকারসমাচ্ছন্না কালিমাময়ী। হৃতসর্বস্বা, এই জন্য নগ্নিকা। আজি দেশের সর্বত্রই শ্মশান—তাই মা কঙ্কালমালিনী। আপনার শিব আপনার পদতলে দলিতেছেন—হায় মা!

ব্রহ্মচারীর চক্ষে দর দর ধারা পড়িতে লাগিল। মহেন্দ্র জিজ্ঞাসা করিলেন, 'হাতে খেটক খর্পর কেন?'

ব্রহ্ম আমরা সন্তান, অস্ত্র মার হাতে এই দিয়াছি মাত্র—বল, বন্দে মাতরম্।

'বন্দে মাতরম্' বলিয়া মহেন্দ্র কালীকে প্রণাম করিল। তখন ব্রহ্মচারী বলিলেন 'এই পথে আইস'। এই বলিয়া তিনি দ্বিতীয় সুরঙ্গ আরোহণ করিতে লাগিলেন। সহসা তাঁহাদিগের চক্ষে প্রাতঃসূর্যের রশ্মিরাশি প্রভাসিত হইল। চারিদিক হইতে মধুকণ্ঠ পক্ষিকুল গায়িয়া উঠিল। দেখিলেন, এক মর্মর প্রস্তর নির্মিত প্রশস্ত মন্দিরের মধ্যে সুবর্ণ নির্মিত দশভুজা প্রতিমা নবারুণ কিরণে জ্যোতির্ময়ী হইয়া হাসিতেছে। ব্রহ্মচারী প্রণাম করিয়া বলিলেন,—'এই মা যা হইবেন। দশ ভুজ দশ দিকে প্রসারিত,—তাহাতে নানা আয়ুধরূপে নানা শক্তি শোভিত, পদতলে শত্রু বিমর্দিত পদাশ্রিত, বীরকেশরী শত্রু নিপীড়নে নিযুক্ত দিগ্‌ভুজা—' বলিতে বলিতে সত্যানন্দ গদ্গদকণ্ঠে কাঁদিতে লাগিলেন। 'দিগ্‌ভুজা—নানাপ্রহরণধারিণী—শত্রুবিমর্দিনী—বীরেন্দ্র-পৃষ্ঠবিহারিণী—দক্ষিণে লক্ষ্মী ভাগ্যরূপিনী—বামে বাণী বিদ্যাবিজ্ঞানদায়িনী—সঙ্গে বলরূপী কার্তিকেয়, কার্যসিদ্ধি-রূপী গণেশ ; এস, আমরা মাকে উভয়ে প্রণাম করি।'......

উভয়ে ভক্তিভাবে প্রণাম করিয়া গাত্রোত্থান করিলে, মহেন্দ্র গদ্গদকণ্ঠে জিজ্ঞাসা করিলেন, 'মার এ মূর্তি কবে দেখিতে পাইব ?'

ব্রহ্মচারী বলিলেন, 'যবে মার সকল সন্তান মাকে মা বলিয়া ডাকিবে, সেই দিন উনি প্রসন্ন হইবেন।'

[সংক্ষেপিত]

॥ অনুশীলনী ॥

১. ব্রহ্মচারী কর্তৃক মূর্তিগুলির বর্ণনা দাও।

২. বিষ্ণুর কোলে কে বসে আছেন ? তার রূপটি বর্ণনা কর।

৩. মহেন্দ্র প্রথমে কোন্ মূর্তি দেখলেন ? সে মূর্তিটির রূপ কেমন ?

৪. ব্রহ্মচারী দ্বিতীয় মূর্তিটিতে কি বলতে চেয়েছেন ? তার রূপ বর্ণনা কর।

৫. তৃতীয় মূর্তিটিতে কিসের ইঙ্গিত পাওয়া যায় ? এই মূর্তিটির রূপটি বর্ণনা কর।

৬. 'মা যা হইবেন'—কোন্ মার কথা বলা হয়েছে? কে কাকে ঐ কথা বলেছেন? মূর্তিটি কেমন? কবে ঐ মূর্তিটি প্রসন্ন হবেন?

৭. 'মহেন্দ্র প্রথমে তাহা দেখতে পাইল না'—কোথায়? প্রথমে দেখতে পেল না কেন? পরে যা যা দেখল তার একটি বিবরণ দাও।

৮. 'মা যা হইয়াছেন'—কোন্ মা? তাঁর রূপ কেমন হয়েছে?

৯. 'যবে মার সকল সন্তান মাকে মা বলিয়া ডাকিবে, সেইদিন উনি প্রসন্ন হইবেন'—উক্তিটি কার? কাকে বলেছেন? কি দেখে এই কথা বললেন? উক্তিটির অর্থ পরিস্ফুট কর।

১০. 'আজি দেশের সর্বত্রই শ্মশান—তাই মা কঙ্কালমালিনী'—কার লেখা? কোন গল্পে আছে? উক্তিটির মধ্য দিয়ে বক্তা কি বোঝাতে চেয়েছেন?

১১. অর্থ লিখ:

অভ্যন্তরে, প্রকোষ্ঠ, চতুর্ভুজ, ঘূর্ণ্যমানপ্রায়, রুধির, ঐশ্বর্য্যান্বিতা, বন্দেমাতরম্, ভূগর্ভস্থ, ক্ষীণালোক, নগ্নিকা, খর্পর, আরোহণ, আয়ুধ, বীরকেশরী, দিগ্‌ভুজা, ভয়ত্রস্ত।

১২. বাক্য গঠন কর:

প্রকোষ্ঠ, চিত্রিত, মোহিনী, ছিন্নমস্ত, অপরূপ, পদ্মাসন, ক্ষীণালোক, পদতলে, প্রভাসিত, নিপীড়ন, গদগদ, গাত্রোত্থান।

১৩. পদ পরিবর্তন কর:

উত্থান, প্রসন্ন, নির্মিত, শোভিত, আরোহণ, আশ্রিত, প্রণাম, ভীত, অধিক, বিষ্ণু, ছিন্ন।

১৪. সন্ধি বিচ্ছেদ কর:

দেবালয়, অভ্যন্তর, মহেন্দ্র, চতুর্ভুজ, ঐশ্বর্যান্বিতা, জগদ্ধাত্রী, ক্ষীণালোক, সমাচ্ছন্না, জ্যোতির্ময়ী, সত্যানন্দ, গাত্রোত্থান, কক্ষান্তর।

———

Our motherland of the past present and future times has been personified in a figurative way.



ভীল প্রদেশের সৌন্দর্য্য

—রমেশ চন্দ্র দত্ত

[রমেশ চন্দ্র দত্ত ঐতিহাসিক উপন্যাস রচনায় বাঙ্‌লা সাহিত্যে চিরস্থায়ী আসন পেয়েছেন। তাঁর রচিত 'রাজপুত-জীবন সন্ধ্যা' ঐতিহাসিক উপন্যাস থেকে নীচের অংশটি নেওয়া হয়েছে। নিসর্গ বর্ণনাই নিবন্ধটির প্রতিপাদ্য বিষয়। তিলক সিংহের বালক পুত্র তেজসিংহ এক সময় চারিণী দেবীর মন্দির থেকে বের হয়ে যখন পথ পরিক্রমা করেছিল, তখনকার প্রাকৃতিক সৌন্দর্যই নিবন্ধটির বিষয়বস্তু।]

হল্‌দিঘাটের যুদ্ধ হইয়া গিয়াছে। একদিন অপরাহ্ণে তেজসিংহ একটি ভীল প্রদেশের মধ্য দিয়া পথ অতিবাহন করিতেছিলেন।

তেজসিংহ যদি নিজ চিন্তায় অভিভূত না থাকিতেন, তবে সেই নির্জন ভীল প্রদেশের শোভা সন্দর্শন করিয়া চমৎকৃত হইতেন, পথের উভয় পার্শ্বে নিবিড় কৃষ্ণবর্ণ সহস্র হস্ত উচ্চ প্রাচীরের ন্যায় পর্বতরাজি উত্থিত হইয়া যেন সেই নির্জন পথকে গোপনে রক্ষা করিতেছে। পর্বত চূড়ায় ও পার্শ্বদেশে অসংখ্য পর্বত বৃক্ষ ও লতা-পুষ্প বায়ু-হিল্লোলে ক্রীড়া করিতেছে এবং অপরাহ্ণের স্তিমিত সূর্যালোকে হাস্য করিতেছে। সে সূর্যালোক বহুদূর নীচস্থ পর্বত তলের পথ পর্যন্ত পৌঁছিতেছে না। তেজসিংহ যে পথ দিয়া যাইতেছিলেন, সে পথ অপরাহ্ণেই প্রায় অন্ধকারময়। কোন কোন স্থলে উন্নত পর্বত শিখর হইতে সূর্যালোক প্রতিফলিত হইয়া সেই পথের উপর ঈষৎ আলোক বিতরণ করিতেছিল ; অন্যস্থলে সেই বৃক্ষাচ্ছাদিত পথ একেবারে অন্ধকারময়। সেই নির্জন পথের পার্শ্ব

দিয়া একটি ক্ষুদ্র পর্বত নদী কল্‌কল্ শব্দে শিলা-শয্যার উপর দিয়া দ্রুতবেগে বহিয়া যাইতেছে। যেন পার্শ্বস্থ প্রহরী-স্বরূপ উন্নত ও কঠোর পর্বত-রাশিকে উপহাস করিয়া কোন ক্রীড়া পটু বালিকা হাসিয়া হাসিয়া দৌড়াইয়া যাইতেছে। স্থানে স্থানে স্তিমিত দিবালোকে সেই নদীর জল চক্‌মক্ করিতেছে, অন্য স্থানে সে নদীর গতি কেবল শব্দমাত্রে অনুমেয়, সেই উন্নত পর্বতের কঠোর বক্ষ হইতে কোন কোন স্থানে গুচ্ছ গুচ্ছ রৌপ্য-সূত্রের ন্যায় নির্ঝরিণী বহিষ্কৃত হইয়া সেই স্থানে নীচস্থ নদীর সহিত কল্‌কল্ শব্দে মিশিয়া যাইতেছে।

ভীল প্রদেশের বিস্ময়কর সৌন্দর্যের ন্যায় সৌন্দর্য জগতের অল্প স্থানেই দেখিতে পাওয়া যায়। একজন আধুনিক ফরাসী ভ্রমণকারী মুক্তকণ্ঠে স্বীকার করিয়াছেন যে ইউরোপের সমস্ত মনোহর স্থল অপেক্ষাও রাজস্থানের ভীল প্রদেশ সুন্দর ও বিস্ময়কর।

** তেজসিংহ এইরূপ নির্জন পথ একাকী অতিবাহন করিতেছিলেন। পর্বত চূড়ার উপর স্থানে ভীলদিগের 'পাল' অর্থাৎ বাসস্থান দৃষ্ট হইতেছে ; নীচের পথ হইতে দেখিলে বোধ হয় যেন মনুষ্যের আবাস নহে, যেন ঈগল পক্ষী নিজ শাবকগুলিকে লালন-পালন করিবার জন্য পর্বত চূড়ায় কুলায় নির্মাণ করিয়াছে। প্রত্যেক 'পালের' চতুর্দিকে বা নীচে অল্প মাত্র ভূমি কর্ষিত, সেই ভূমির উৎপন্ন দ্রব্য ভীলদিগের আহারের অবলম্বন।

** সেই উপত্যকা অতিক্রম করিয়া কতক দূর আসিতে আসিতে তেজসিংহ একটি রমণীয় ও অতি বিস্তীর্ণ হ্রদের কূলে উপনীত হইলেন। পূর্ব-বর্ণিত পর্বত নদী সেই স্বচ্ছ সুন্দর পর্বত হ্রদে আসিয়া মিশিয়াছে। হ্রদের চতুর্দিকে, যতদূর মনুষ্য নয়নে দৃষ্ট হয়, কেবল পর্বতরাশির পর পর্বতরাশি পর্বত বৃক্ষে আচ্ছাদিত হইয়া বিস্ময়কর চিত্রের ন্যায় বিন্যস্ত রহিয়াছে। হ্রদের কূলে যাইয়া তেজসিংহ একবার সম্মুখ অবলোকন করিলেন এবং সেই মনোহর প্রকৃতির শোভা দেখিয়া নিজের চিন্তা একবার ভুলিলেন।

সায়ংকালের লোহিত আলোক সেই হ্রদের জলের উপর পতিত হইয়া কি অপূর্ব শোভা ধারণ করিয়াছে! জলের নিস্তব্ধ বক্ষের উপর চারিদিকের উন্নত পর্বতের ছায়া কি সুন্দরভাবে পতিত হইয়াছে। এখানে শব্দ নাই, মনুষ্যের গমনাগমন নাই, জীব-আবাসের চিহ্নমাত্র নাই, যেন প্রকৃতি এই সুন্দর জগৎ রচয়িতার পূজার জন্য এই উন্নত পর্বত বেষ্টিত, শান্ত, নির্জন, নিঃশব্দে হ্রদ প্রস্তুত করিয়া রাখিয়াছে। তেজসিংহ অনেকক্ষণ নিঃশব্দে সেই চিত্রখানি দেখিতে লাগিলেন। হ্রদের জলে হস্তমুখ প্রক্ষালন করিয়া তিনি একটি শিলাখণ্ডে উপবেশন করিলেন।

॥ অনুশীলনী ॥

১. 'সেই নির্জন ভীল প্রদেশের শোভা সন্দর্শন করিয়া চমৎকৃত হইতেন'—কে চমৎকৃত হতেন? নির্জন ভীল প্রদেশের শোভা বর্ণনা কর।

২. পাহাড়ী পথে কি কি জিনিষ তোমার দৃষ্টিতে ধরা পড়ে তার একটি বিবরণ দাও।

৩. হ্রদের চিত্রটি অঙ্কন কর।

৪. 'সেই ভূমির উৎপন্ন দ্রব্য ভীলদিগের আহারের অবলম্বন'—কোন্ ভূমি? ভীলদের বাস কোথায়? তাদের বাসস্থানকে কী বলা হয়?

৫. 'সেই চিত্রখানি দেখিতে লাগিলেন'—কে দেখছিলেন? চিত্রটির বর্ণনা দাও।

৬. অর্থ লিখ:

অতিবাহন, অভিভূত, হিল্লোল, প্রতিফলিত, প্রহরী, নির্ঝরিণী, শাবক, রমণীয়, আচ্ছাদিত, বিন্যস্ত, নিস্তব্ধ, প্রক্ষালন, উপবেশন, সন্দর্শন, কৃষ্ণবর্ণ।

৭. বাক্য গঠন কর:

অভিভূত, সন্দর্শন, উপবেশন, ঈষৎ, দ্রুতবেগে, চকমক, অমুমেয়, গুচ্ছগুচ্ছ, মনোহর, বিস্ময়কর, আবাস, অবলম্বন, সায়ংকাল, শিলাখণ্ড, বিতরণ।

৮. চলিত ভাষায় লিখ:

সেই উপত্যকা অতিক্রম করিয়া কতক দূর আসিতে আসিতে তেজসিংহ একটি রমণীয় ও বিস্তীর্ণ হ্রদের কূলে উপনীত হইলেন।

৯. অশুদ্ধ সংশোধন কর:

অভিভুত, পুষ্প, অপরাহ্ন, শিলা-সজ্জা, নির্ঝরিনি, সচ্ছ, গমনোগমন, চিহ্ন।

Description of a beautiful scenery ... region of Rajasthan

বাল্য স্মৃতি



—শিবনাথ শাস্ত্রী

[সাহিত্যিক শিবনাথের একটি অনবদ্য পরিচয় তাঁর 'আত্মচরিত' গ্রন্থটি। আলোচ্য স্মৃতিচারণটি তাঁর ঐ গ্রন্থ থেকে নেওয়া। পাখী, ফড়িং, পিঁপড়ে পুষতে তাঁর কেমন উৎসাহ ও আগ্রহ ছিল তারই নিদর্শন হচ্ছে আলোচ্যাংশটি।]

আমি তখন পশুপক্ষী পুষিতে বড়ো ভালোবাসিতাম। পুষি নাই এমন জন্তুই নাই। টুনটুনি, বুলবুলি, দোয়েল, ছাতারে, শালিক, টিয়া, ও-সকল তো পুষিয়াছি, পিঁপড়েও পুষিতাম। ফড়িং ও পিঁপড়ে পোষা আমার একটা বাতিক ছিল। তাহাদিগকে অতি যত্নে কৌটার মধ্যে রাখিতাম। ফড়িংদিগকে কচি কচি দুর্বাঘাস খাওয়াইতাম, পিঁপড়েদিগকে চিনি মধু প্রভৃতি খাইতে দিতাম। পিঁপড়ের গতিবিধি লক্ষ্য করিতে এতই ভালো লাগিত যে, আমি যখন ৬।৭ বৎসরের ছেলে, তখন পিঁপড়ে হইয়া চারি হাত পায় পিঁপড়েদের সঙ্গে সঙ্গে ঘুরিতাম। মাছি মারিয়া খ্যাংরা কাঠির অগ্রভাগ ভাঙিয়া সেই কাঁটা দ্বারা সেই মাছি দাবার মাটিতে পুঁতিয়া দিতাম, দিয়া কখন পিঁপড়ে আসিয়া মাছি ধরিয়া টানাটানি করিবে সেই অপেক্ষায় বসিয়া থাকিতাম। হয়তো আধ ঘন্টার পর সেখানে একটি পিঁপড়ে দেখা দিল। সে প্রথমে আসিয়া মাছিটির পা ধরিয়া টানাটানি আরম্ভ করিল। যখন দেখিল সহজে টানিয়া লইতে পারে না, তখন চারিদিক প্রদক্ষিণ করিয়া পরীক্ষা আরম্ভ করিল। আমার খ্যাংরা কাঠিটির উপরে একবার উঠে একবার নামে, বড়োই ব্যস্ত। অবশেষে সে চলিয়া গেল। আমি তাহার

সঙ্গে সঙ্গে শুঁড়ি মারিয়া চলিলাম। সে গিয়া গর্তের মধ্যে প্রবিষ্ট হইল। আমি দ্বারে অপেক্ষা করিয়া রহিলাম। আর আধঘণ্টা গেল। শেষে দেখি সৈন্যদল বাহির হইল। পিঁপড়ের সারি, মধ্যে মধ্যে দুইটা করিয়া বলবান অপেক্ষাকৃত দীর্ঘাকৃতি পিঁপড়ে। পরে ভাবিয়াছি, তাহারা সেনাপতি হইবে। প্রকাণ্ড সৈন্যদল ক্রমে আমার মাছির নিকট উপস্থিত, তখন মহা টানাটানি আরম্ভ হইল। অবশেষে আমি খ্যাংরা কাঠিটি তুলিয়া লইলাম। তখন মাছি লইয়া সকলে গর্তের দিকে দৌড়িল। ইহারা ফিরিতেছে, তখন অপরেরা আসিতেছে, পথে মুখোমুখি করিয়া কি সংকেত করিল যে, যাহারা আসিতেছিল, তাহারাও ফিরিল। আমি মনে করিতাম, ইহারা নিশ্চয় কথা কয়। তখন মাটির নিকটে কান পাতিয়া রহিলাম, তাহাদের শব্দ শোনা যায় কি না। কান পাতিয়া আছি, তখন কেহ শব্দ করিলে বারণ করিতাম, 'চুপ করো, চুপ করো, পিঁপড়েরা কী বলছে শুনি।' ইহা দেখিয়া বাড়ির লোকেরা হাসাহাসি করিতেন, এই ব্যাপার প্রায় সর্বদাই ঘটিত।

তৎপর পাখি ধরিবার ও পুষিবার জন্য অতিশয় উৎসাহ ছিল। পাখির বাসা হইতে বাচ্চা চুরি করিয়া আনিতাম, আনিয়া তাহার মায়ের মতো যত্নে তাহাকে পালন করিতাম। সে জাতীয় পাখিরা কী খায়, তাহাদের মায়েরা কিরূপে খাওয়ায়, এ সকল সংবাদ পাড়ার ডানপিটে ছেলেদের কাছে পাইতাম, সেইরূপ করিয়া দিনের মধ্যে দশবার করিয়া খাওয়াইতাম। হাঁড়ির গায়ে ছিদ্র করিয়া তাহার মধ্যে কুটিকাটি দিয়া বাসা বাঁধিয়া তাহার মধ্যে বাচ্চা রাখিতাম। রাখিয়া একখানি সরা দিয়া ঢাকিয়া হাঁড়িটি ঘরের চালে ঝুলাইয়া রাখিতাম, পাছে সাপে খাইয়া যায়। তাহার পর খেজুর গাছের ডাল কাটিয়া, অগ্রভাগের পাতাগুলি চিরিয়া খ্যাংরার মতো করিতাম; তাহাকে বলে ছাট। সেই ছাট হাতে করিয়া মাঠে মাঠে ঘাস বনে ফড়িং ধরিতে যাইতাম। ঘাসের উপর ছাটগাছি বুলাইলেই ফড়িং লাফাইয়া উঠিত। অমনি সেই ছাট সজোরে তাহার পৃষ্ঠদেশে মারিয়া তাহাকে অর্ধমৃত প্রায় করিতাম। সেই অচৈতন্য

অবস্থাতে তাহাকে এক বাঁশের কেঁড়ের মধ্যে পুরিতাম। এইরূপে ঘণ্টার পর ঘণ্টা ফড়িং ধরিতাম। ধরিয়া আনিয়া পাখিকে খাওয়াইতাম। পাখির বাচ্চা পোষা প্রায় বৈশাখ জ্যৈষ্ঠ মাসে হইত। বাবা তখন ছুটিতে বাড়িতে থাকিতেন। তিনি আমার পাখি পোষা দেখিতে পারিতেন না। পড়াশুনার ব্যাঘাত হয়, ইহা সহিতে পারিতেন না। পাখির বাচ্চাকে খাওয়াইতে দেখিলেই আমাকে মারিতেন। সুতরাং তাঁহার অনুপস্থিতি-কালে আমাকে ঐ বাচ্চার মায়ের কাজ করিতে হইত। পিতার হস্তে এত প্রহার খাইয়াও কিরূপে আমি তাহাদিগকে পালন করিতাম, তাহা ভাবিলে আশ্চর্য বোধ হয়।

মা আমার পাখি পোষার বড় বিরোধী ছিলেন না। বোধ হয় ছেলে বাড়িতে থাকে এবং একটা কাজে ভুলিয়া থাকে, এই তাঁহার মনের ভাব ছিল। কিন্তু তাঁহারও পাখি পোষা শখ ছিল। আমি চলিয়া আসিবার পরও তিনি অনেক পাখি পুষিয়াছেন।

আমি যে কেবল বাচ্চা পাখি পুষিতাম তাহা নহে, ধাড়ি পাখিও পুষিতাম। বড়ো পাখি ধরিবার তিন প্রকার কৌশল ছিল। প্রথম, আমাদের উঠানে একটি ধামা খাড়া করিয়া তাহার সম্মুখে চাল কড়াই ছড়াইয়া, ধামার পৃষ্ঠে একগাছি বাকারির অগ্রভাগ লাগাইয়া, অপর প্রান্ত দাবাতে লাগাইয়া অপেক্ষা করিয়া বসিয়া থাকিতাম। কোনো ঘুঘু বা পায়রা বা শালিক যেই আসিয়া একমনে চাল কড়াই খাইত, অমনি বাকারির দ্বারা ধামাটি ঠেলিয়া তাহাকে ধামা চাপা দিতাম। দ্বিতীয়, গাছের ডালে যখন পাখিতে পাখিতে ঝগড়া ও মারামারি করিত, তাহার নীচে গিয়া কাপড়ের জাল পাতিতাম। তাহারা মারামারি করিবার সময় রাগে এমন অন্ধ হয় যে, দুজনে জড়ামড়ি করিয়া পাকা ফলটির মতো গাছের তলায় পড়িয়া যায়। কখনো কখনো ঐরূপে আমার কাপড়ে পড়িয়া যাইত। তৃতীয়, টুনটুনি দোয়েল প্রভৃতি ক্ষুদ্র পাখিরা যখন অন্যমনস্কভাবে গাছের ডালে বসিয়া থাকিত, তখন ভোঁ করিয়া তাহার পায়ের নিকটস্থ ডালে সজোরে ঢিল মারিতাম। হঠাৎ তাহাদের পায়ের

নিকটস্থ ডালে সজোরে ঢিল লাগাতে তাহারা দিশেহারা হইয়া পড়িয়া যাইত, আমি অমনি তাহাদিগকে ধরিতাম।

॥ অনুশীলনী ॥

১. পিঁপড়ের গতিবিধি বর্ণনা কর। তিনি কি কি ধরণের পাখি পুষিতেন ?

২. পাখিকে কিভাবে তিনি মায়ের মত যত্ন করতেন ? পাখিদের খাওয়া ও যত্ন করার পদ্ধতি লেখক কোথা থেকে জেনেছিলেন ?

৩. 'বড়ো পাখি ধরিবার তিন প্রকার কৌশল ছিল'—এই তিন প্রকার কৌশলের বর্ণনা দাও।

৪. 'ইহা দেখিয়া বাড়ির লোকেরা হাসাহাসি করিতেন'—কি দেখে ? বাড়ীর লোকেরা কেন হাসাহাসি করতেন ?

৫. মাছি মারত কেন ? ছাট কাকে বলে ? ফড়িং কেন মারত ? ফড়িংকে কি খেতে দিত ? পিঁপড়েদের জন্য কি খাবার রাখত ? মা লেখকের পাখি পোষার বিরোধী ছিলেন না কেন ? বাবা পাখি পোষার বিরোধী ছিলেন কেন ?

৬. 'আমি তখন পশুপক্ষী পুষিতে বড়ো ভালোবাসিতাম'—কে ? তাঁর পাখি পোষার গল্পটি লেখ। কি কি পাখি পুষতেন ?

৭. 'ইহারা নিশ্চয় কথা কয়'—কারা ? কথা কওয়াটা কিভাবে বুঝেছিলেন ? এর জন্য তিনি কি করতেন ?

৮. 'সেই ছাট হাতে করিয়া মাঠে মাঠে ঘাস বনে ফড়িং ধরিতে যাইতাম'—'ছাট' কোন্ জিনিসকে বলে ? কে ফড়িং ধরতো ? কিভাবে ফড়িং ধরত ? কেন ধরত ?

৯. 'ইহা সহিতে পারিতেন না'—কে কি সইতে পারতেন না ? সইতে না পেরে তিনি কি করতেন ? এই জিনিস কে সইতেন এবং কেন ?

১০. অর্থ লিখ :

গতিবিধি, অগ্রভাগ, দীর্ঘাকৃতি, সজোরে, পৃষ্ঠদেশে, অর্ধমৃতপ্রায়, অন্যমনস্ক, নিকটস্থ, দিশেহারা, দাবা।

১১. বাক্য রচনা কর :

বাতিক, টানাটানি, প্রবিষ্ট, হাসাহাসি, কুটিকাটি, ডানপিটে, মুখোমুখি, সৈন্যদল, অনুপস্থিতি, প্রহার, বিরোধী, খ্যাংরা, জড়াজড়ি, দিশেহারা।

———

vivid description of the peculiar hobby of the childhood days of the writer.



[রবীন্দ্রনাথ কবি, রবীন্দ্রনাথ প্রবন্ধকার। গ্রাম্য মেলা দেশের মানুষকে যে স্বদেশপ্রেমের উদ্দীপনা জোগায় তারই ইঙ্গিত দিচ্ছে আলোচ্য প্রবন্ধটি। দিশি লোকের সঙ্গে দিশি ধারায় মিলবার ও মিশবার উপলক্ষ্য হিসাবেই প্রবন্ধটির মূল্যায়ন।]

আমাদের দেশ প্রধানতঃ পল্লীবাসী। এই পল্লী মাঝে মাঝে যখন আপনার নাড়ীর মধ্যে বাহিরের বৃহৎ জগতের রক্ত চলাচল অনুভব করিবার জন্য উৎসুক হইয়া উঠে, তখন মেলাই তাহার প্রধান উপায়। এই মেলাই আমাদের দেশে বাহিরকে ঘরের মধ্যে আহ্বান। এই উৎসবে পল্লী আপনার সমস্ত সংকীর্ণতা বিস্মৃত হয়—তাহার হৃদয় খুলিয়া দান করিবার ও গ্রহণ করিবার এই প্রধান উপলক্ষ্য। যেমন আকাশের জলে জলাশয় পূর্ণ করিবার সময় বর্ষাগম, তেমনি বিশ্বের ভাবে পল্লীর হৃদয়কে ভরিয়া দিবার উপযুক্ত অবসর মেলা।

এই মেলা আমাদের দেশে অত্যন্ত স্বাভাবিক। একটা সভা উপলক্ষ্যে যদি দেশের লোককে ডাক দাও, তবে তাহারা সংশয় লইয়া আসিবে, তাহাদের মন খুলিতে অনেক দেরি হইবে—কিন্তু মেলা উপলক্ষ্যে যাহারা একত্র হয় তাহারা সহজেই হৃদয় খুলিয়া আসে—সুতরাং এইখানেই দেশের মন পাইবার প্রকৃত অবকাশ ঘটে। পল্লীগুলি যেদিন হাল-লাঙ্গল বন্ধ করিয়া ছুটি লইয়াছে, সেইদিনই তাহাদের কাছে আসিয়া বসিবার দিন।

বাংলা দেশে এমন জেলা নাই যেখানে নানা স্থানে বৎসরের নানা সময়ে মেলা না হইয়া থাকে—প্রথমতঃ এই জেলাগুলির তালিকা ও বিবরণ সংগ্রহ করা আমাদের কর্তব্য। তাহার পরে এই মেলাগুলির সূত্রে দেশের লোকের সঙ্গে যথার্থ ভাবে পরিচিত হইবার উপলক্ষ্য আমরা যেন অবলম্বন করি।

প্রত্যেক জেলার ভদ্র শিক্ষিত সম্প্রদায় তাঁহাদের জেলার মেলাগুলিকে যদি নবভাবে জাগ্রত, নবপ্রাণে সজীব করিয়া তুলিতে পারেন, ইহার মধ্যে দেশের শিক্ষিতগণ যদি তাঁহাদের হৃদয় সঞ্চার করিয়া দেন, এই সকল মেলায় যদি তাঁহারা হিন্দু মুসলমানের মধ্যে সদ্ভাব স্থাপন করেন—কোনোপ্রকার নিষ্ফল পলিটিক্সের সংস্রব না রাখিয়া বিদ্যালয়, পথঘাট, জলাশয়, গোচর-জমি প্রভৃতি সম্বন্ধে জেলার যে সমস্ত অভাব আছে, তাহার প্রতিকারের পরামর্শ করেন, তবে অতি অল্পকালের মধ্যে স্বদেশকে যথার্থই সচেষ্ট করিয়া তুলিতে পারেন।

আমার বিশ্বাস যদি ঘুরিয়া ঘুরিয়া বাংলাদেশে নানাস্থানে মেলা করিবার জন্য একদল লোক প্রস্তুত হন—তাঁহারা নূতন নূতন যাত্রা, কীর্তন, কথকতা রচনা করিয়া সঙ্গে বায়োস্কোপ, ম্যাজিক লণ্ঠন, ব্যায়াম ও ভোজবাজির আয়োজন লইয়া ফিরিতে থাকেন, তবে ব্যয় নির্বাহের জন্য তাঁহাদিগকে কিছু মাত্র ভাবিতে হয় না। তাঁহারা যদি মোটের উপরে প্রত্যেক মেলার জন্য জমিদারকে একটি বিশেষ খাজনা ধরিয়া দেন এবং দোকানদারদের নিকট হইতে যথানিয়মে বিক্রয়ের লভ্যাংশ আদায় করিবার অধিকার প্রাপ্ত হন—তবে উপযুক্ত সুব্যবস্থা দ্বারা সমস্ত ব্যাপারটাকে বিশেষ লাভকর করিয়া তুলিতে পারেন। এই লাভের টাকা হইতে পারিশ্রমিক ও অন্যান্য খরচ বাদে যাহা উদ্‌বৃত্ত হইবে, তাহা যদি দেশের কার্যেই লাগাইতে পারেন, তবে সেই মেলার দলের সহিত সমস্ত দেশের হৃদয়ের সম্বন্ধ অত্যন্ত ঘনিষ্ঠ হইয়া উঠিবে—ইহারা সমস্ত দেশকে তন্ন তন্ন করিয়া জানিবেন এবং ইহাদের দ্বারা যে কত কাজ হইতে পারিবে, তাহা বলিয়া শেষ করা যায় না।

॥ অনুশীলনী ॥

১. পল্লীগ্রামে মেলার অনুষ্ঠানের মধ্যে লেখকের যে ধারণাটি ফুটে উঠছে তা প্রবন্ধ অনুসরণে ব্যক্ত কর।

২. মেলা আমাদের কি কি উপকারে আসে এবং কি কি ভাবে কাজে লাগান যেতে পারে তা আলোচনা কর।

৩. 'এই মেলা আমাদের দেশে অত্যন্ত স্বাভাবিক'—কোন্ মেলা ? আমাদের দেশের পক্ষে তা স্বাভাবিক কোন্ অর্থে ?

৪. 'ইহাদের দ্বারা যে কত কাজ হইতে পারিবে, তা বলিয়া শেষ করা যায় না'—কাদের দ্বারা ? তাদের দ্বারা কি কি কাজ হতে পারে এবং কিভাবে হতে পারে ?

৫. 'মেলাই তাহার প্রধান উপায়'—কার ? মেলা তাদের প্রধান উপায় কেন ? মেলা কি করে ?

৬. 'যেমন আকাশের জলে জলাশয় পূর্ণ করিবার সময় বর্ষাগম, তেমনি বিশ্বের ভাবে পল্লীর হৃদয়কে ভরিয়া দিবার উপযুক্ত অবসর মেলা'—প্রসঙ্গ নির্দেশ করে উক্তিটির ব্যাখ্যা কর। লেখক কে ? কোন্ গল্পে আছে ?

৭. 'সেইদিনই তাহাদের কাছে আসিয়া বসিবার দিন'—কোন্ দিন এবং কেন ?

৮. 'স্বদেশকে যথার্থই সচেষ্ট করিয়া তুলিতে পারেন'—কারা এবং কিভাবে ?

৯. অর্থ লিখ :

আহ্বান, সংকীর্ণতা, উপলক্ষ্য, নবভাবে, সজীব, সংস্রব, গোচর-জমি, নির্বাহ, লভ্যাংশ, প্রাপ্ত, উদ্‌বৃত্ত, ঘনিষ্ঠ।

The utility of village fair.



অতিথি

—শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়

[শরৎচন্দ্র শিল্পী, শরৎচন্দ্র ভাবুক। তাঁর দরদী মন প্রতিটি মানুষের, প্রতিটির জীবের অন্তরকে স্পর্শ করেছে। একটি পথের কুকুরের প্রতি তাঁর স্নেহ-বাৎসল্য কত গভীর তাই প্রকাশ পেয়েছে এই গল্পে।]

সেদিন বন্ধু গেছেন ভ্রমণে। সন্ধ্যার তখনও দেরি আছে, দেখি জন কয়েক বৃদ্ধ ব্যক্তি ক্ষুধা আহরণের কর্তব্যটা সমাধা করে যথারীতি দ্রুতপদেই ত্রস্ত বাসায় ফিরছেন। সম্ভবতঃ এঁরা বাত-ব্যাধিগ্রস্ত, সন্ধ্যার পূর্বেই এঁদের ঘরে প্রবেশ করা প্রয়োজন। তাঁদের চলন দেখে ভরসা হলো, ভাবলাম যাই, আমিও একটু ঘুরে আসি গে। সেদিন পথে অনেক বেড়ালাম। অন্ধকার হয়ে এলো, ভেবেছিলাম আমি একাকী, হঠাৎ পিছনে চেয়ে দেখি একটি কুকুর আমার পিছনে চলেছে। বললাম, কিরে, যাবি আমার সঙ্গে? অন্ধকার পথটায় বাড়ী পর্যন্ত পৌঁছে দিতে পারবি? সে দূরে দাঁড়িয়ে লেজ নাড়তে লাগল বুঝলাম, সে রাজি আছে। বললাম, তবে আয় আমার সঙ্গে। পথের ধারের একটা আলোতে দেখতে পেলাম কুকুরটার বয়স হয়েছে, রোগে পিঠের লোম উঠে গেছে, একটু খুঁড়িয়ে চলে। কিন্তু যৌবনে একদিন শক্তি সামর্থ্য ছিল তা বুঝা যায়। তাকে অনেক কিছু প্রশ্ন করতে করতে বাড়ির সুমুখে এসে পৌঁছুলাম। গেট খুলে দিয়ে ডাকলাম, ভেতরে আয়, আজ তুই আমার অতিথি। সে বাইরে দাঁড়িয়ে লেজ নাড়তে লাগল, কিছুতে ভিতরে ঢোকার ভরসা পেল না। আলো নিয়ে চাকর এসে উপস্থিত হল, গেট বন্ধ করে দিতে চাইল, বললাম, না খোলাই থাক। যদি আসে, ওকে

খেতে দিস। ঘণ্টাখানেক পরে খোঁজ নিয়ে জানলাম সে আসেনি—কোথায় চলে গেছে।

পরদিন সকালে বাইরে এসেই দেখি গেটের বাইরে দাঁড়িয়ে আমার সেই কালকের অতিথি। বললাম, কাল তোকে খেতে নেমন্তন্ন করলাম, এলিনে কেন?

জবাবে সে মুখ পানে চেয়ে লেজ নাড়তে লাগল। বললাম, আজ তুই খেয়ে যাবি,—না খেয়ে যাসনে। বুঝলি? প্রত্যুত্তরে সে শুধু ঘন ঘন লেজ নাড়লে—অর্থ বোধ হয় এই যে—সত্যি বলছ তো?

রাত্রে চাকর এসে জানালে সেই কুকুরটা এসে আজ বাইরের বারান্দার নীচে উঠানে বসে আছে। বামুন ঠাকুরকে ডেকে বলে দিলাম, ও আমার অতিথি, ওকে পেট ভরে খেতে দিও।

পরের দিন খবর পেলাম অতিথি যায়নি। আতিথ্যের মর্যাদা লঙ্ঘন করে সে আরামে নিশ্চিন্ত হয়ে বসে আছে। বললাম, তা হোক, ওকে তোমরা খেতে দিও।

আমি জানতাম প্রত্যহ খাবার ত অনেক ফেলা যায়। এতে কারো আপত্তি হবে না। কিন্তু আপত্তি ছিল এবং অত্যন্ত গুরুতর আপত্তি। আমাদের বাড়তি খাবারের যে প্রবল অংশীদার ছিল সে বাগানের মালির মালিনী—এ আমি জানতাম না।...অতএব, আমার অতিথি করে উপবাস। বিকালে পথের ধারে গিয়ে বসে দেখি অতিথি আগে থেকেই বসে আছে ধুলোয়। বেড়াতে বার হলে সে হয় পথের সঙ্গী, জিজ্ঞাসা করি, হাঁ অতিথি আজ মাংস রান্নাটা কেমন হয়েছিল রে? হাড়গুলো চিবোতে চিবোতে স্থির চিত্তে সে জবাব দেয় লেজ নেড়ে, মনে করি মাংসটা তাহলে ওর ভালই লেগেছে।......

হঠাৎ শরীর খারাপ হল, দিন দুই নীচে নামতে পারলাম না। দুপুর বেলা উপরের ঘরে বিছানায় শুয়ে। খবরের কাগজটা সেই মাত্র পড়া হয়ে গেছে। জানালার মধ্য দিয়ে বাইরের রৌদ্র তপ্ত নীল আকাশের পানে চেয়ে অন্যমনস্ক হয়ে ভাবছিলাম। এমন সময় সহসা খোলা দোর

দিয়ে সিঁড়ির উপর ছায়া পড়ল কুকুরের। মুখ বাড়িয়ে দেখি অতিথি দাঁড়িয়ে লেজ নাড়ছে।···ভাবলাম, দুদিন দেখতে পায়নি, তাই বুঝি আমাকে ও দেখতে এসেছে। ডাকলাম, আয় অতিথি, ঘরে আয়, সে এলো না। সেখানে দাঁড়িয়েই লেজ নাড়তে লাগল। জিজ্ঞাসা করলাম, খাওয়া হয়েছে তবে? কি খেলি আজ?

হঠাৎ মনে হল ওর চোখ দুটো ভিজে, সে গোপনে আমার কাছে কি একটা নালিশ জানাতে চায়। চাকরদের হাঁক দিলাম। ওদের দোর খোলার সঙ্গেই অতিথি ছুটে পালালো।

জিজ্ঞাসা করলাম, হ্যাঁরে, কুকুরটাকে আজ খেতে দিয়েছিস?

আজ্ঞে না। মালি বৌ ওরে তাড়িয়ে দিয়েছে যে!

আজ যে অনেক খাবার বেঁচেছে, সে সব হল কি?

হাঙ্গামা শুনে বন্ধু ঘুম ভেঙে চোখ রগড়াতে রগড়াতে ঘরে এলেন। মুচকি হেসে বললেন, দাদার এক কাণ্ড! মানুষ খেতে পায় না, পথের কুকুরকে ডেকে খাওয়ানো! বেশ। শুনে চুপ করে রইলাম। সংসারে কার দাবী যে কার কাছে কোথায় গিয়ে পৌঁছায়, সে ওদের আমি বোঝাব কি দিয়ে।

বেলা যায়। বিকেল হলে উপরের বারান্দা থেকে দেখি অতিথি এই দিকে চেয়ে প্রস্তুত হয়ে দাঁড়িয়ে। বেড়াতে যাবার সময় হল যে!

আমার শরীর সারল না। বিদায় নেবার দিন এসে পড়ল।···সকাল থেকে জিনিব বাঁধাবাধি সুরু হল—দুপুরে ট্রেন। গেটের বাইরে সার গাড়ী এসে দাঁড়াল, মালপত্র বোঝাই দেওয়া চলল। অতিথি মহাব্যস্ত, কুলিদের সঙ্গে ক্রমাগত ছুটাছুটি করে খবরদারি করতে লাগল, কোথাও যেন কিছু খোয়া না যায়, তার উৎসাহই সবচেয়ে বেশি।

একে একে গাড়িগুলো ছেড়ে দিল, আমার গাড়ীটাও চলতে সুরু করল। স্টেশন দূরে নয়, সেখানে পৌঁছে গিয়ে দেখি অতিথি দাঁড়িয়ে। কিরে এখানেও এসেছিস্? সে লেজ নেড়ে তার জবাব দিলে, কি জানি মানে তার কি।

টিকিট কেনা হোল, মালপত্র তোলা হোল, বন্ধু এসে খবর দিলেন—ট্রেন ছাড়তে আর এক মিনিট দেরী। সঙ্গে যারা তুলে দিতে এসেছিল তারা বকশিস্ পেল সবাই, পেল না কেবল অতিথি। গরম বাতাসে ধুলো উড়িয়ে সামনেটা আছন্ন করেছে, যাবার আগে তারই মধ্য দিয়ে ঝাপসা দেখতে পেলাম—স্টেশনের ফটকের বাইরে দাঁড়িয়ে একদৃষ্টে চেয়ে আছে অতিথি। ট্রেন ছেড়ে দিলে, কেবলই মনে হতে লাগল অতিথি আজ ফিরে গিয়ে দেখবে বাড়ির লোহার গেট বন্ধ—ঢোকবার যো নেই। পথে দাঁড়িয়ে দিন দুই তার কাটবে, হয়তো নিস্তব্ধ মধ্যাহ্নের ফাঁকে লুকিয়ে উপরে উঠবে, খুজে দেখবে আমার ঘরটা—তারপরে পথের কুকুর পথেই আশ্রয় নেবে।

॥ অনুশীলনী ॥

১. 'অতিথি' গল্পটির মূল বক্তব্যটি বিবৃত কর।

২. 'অতিথি' গল্পের সারাংশ লেখ।

৩. কখন কিভাবে অতিথির সঙ্গে লেখকের পরিচয় হোল? লেখক তার জন্য কি কি করলেন?

৪. 'পথের কুকুর পথেই আশ্রয় নেবে'—উক্তিটির মধ্যে বক্তার যে মনোভাবটি ফুটে উঠেছে তা ব্যক্ত কর।

৫. 'সেদিন পথে অনেক বেড়ালাম'—কোন্ দিন? কে বেড়ালেন? বেড়িয়ে ফেরার পর কার সঙ্গে দেখা হোল এবং সে কি করল?

৬. 'পরের দিন খবর পেলাম অতিথি যায়নি'—অতিথিটি কে? সে কোথায় ছিল? কেন যায়নি?

৭. 'এতে কারো আপত্তি হবে না'—কিসে? কেন আপত্তি হবে না? কেন আপত্তি উঠেছিল? তার ফল কি হোল?

৮. 'সংসারে কার দাবী যে কার কাছে কোথায় গিয়ে পৌঁছায়, সে ওদের আমি বোঝাব কি দিয়ে'—'আমি' কে? 'ওদের' বলতে কাদের? প্রসঙ্গটি উল্লেখ করে উদ্ধৃতিটির মূল অর্থটি বুঝিয়ে দাও।

৯. 'পেল না কেবল অতিথি'—অতিথি কি পেল না, কেন পেল না? অতিথির সঙ্গে বক্তার সম্পর্ক কি?

১০. বাক্য রচনা কর:

আহরণ, সম্ভবতঃ, নেমতন্ন, প্রত্যুত্তর, লঙ্ঘন, রৌদ্রতপ্ত, মহাব্যস্ত, খবরদারি, আচ্ছন্ন, নিস্তব্ধ।

The love for a street dog



জল

—রাজশেখর বসু

[ভারতের "খনিজ সম্পদ" সম্বন্ধে আলোচনা প্রসঙ্গে রাজশেখর বসু মহাশয় জলের প্রকার ভেদ ও জলের উপকারিতা সম্বন্ধে নীচের প্রবন্ধে বিশেষ তথ্যপূর্ণ আলোচনা করেছেন।]

যত রকম খনিজ আছে তার মধ্যে জল মানুষের সবচেয়ে দরকারী। জলের বিশাল ভাণ্ডার সমুদ্র, তা ছাড়া নদী হ্রদ প্রভৃতিও আছে। সূর্যতাপে বাষ্পীভূত জল বায়ুতে মিশে যায়, উপরে উঠে ঠাণ্ডা হয়ে মেঘে পরিণত হয়, আবার বৃষ্টিরূপে নীচে ফিরে আসে। জল বাষ্পের কতক অংশ হিমালয় শিখরে বরফ হয়ে জমে এবং গ্রীষ্মে সেই বরফ গলে সিন্ধু, গঙ্গা, যমুনা, ব্রহ্মপুত্র প্রভৃতির খাতে প্রবাহিত হয়। অনেক নদী উপনদীর উৎপত্তি শুধু বৃষ্টির জল থেকে, যেমন, নর্মদা, গোদাবরী, কাবেরী প্রভৃতি। বৃষ্টির এবং নদীবাহিত জলের কতকটা মাটিতে শোষিত হয়, কতকটা সমুদ্রে চলে যায়।

সমুদ্রের জলে শতকরা প্রায় ৩½ ভাগ নানা জাতীয় লবণ আছে। তার মধ্যে সোডিয়াম ক্লোরাইড অর্থাৎ সাধারণ নুনই বেশী। তার চেয়ে অনেক কম আছে ম্যাগানিসিয়ম, পোটাসিয়ম ও ক্যালসিয়ম যুক্ত লবণ, আরও কম ফসফেট সিলিকা, তামা, সোনা, রুপো। সমুদ্রজল থেকে নুন তৈরী অতি প্রাচীন শিল্প।

অনেক শিলার উপাদান ক্যালসিয়ম কার্বনেট। চুনে পাথর এবং খড়ি তাতেই গঠিত। এই পদার্থ জলে গলে না, কিন্তু জলে অঙ্গারাম্ল থাকলে

গলে, বৃষ্টির জলে অঙ্গারাম্ল থাকায় এই জাতীয় শিলার নিরন্তর ক্ষয় হচ্ছে এবং সেই দ্রবীভূত ক্যালসিয়ম কার্বনেট নদীর জলে মিশে অবশেষে সমুদ্রে যাচ্ছে। মাটিতে যদি অন্য দ্রবণীয় উপাদান থাকে (সাধারণ লবণ, ম্যাগনিসিয়ম-যুক্ত লবণ ইত্যাদি) তবে তাও সেই জলে গৃহীত হয়। এই রকম ক্যালসিয়ম-ম্যাগনিসিয়ম-যুক্ত পদার্থ যে জলে বেশী তাকে বলা হয় খরজল (hard water), যাতে কম তার নাম মৃদুজল (soft water)। বিহার, যুক্তপ্রদেশ, রাজপুতানা প্রভৃতি স্থানে এবং কলকাতার কাছে অনেক কুয়োর জল খরজল। দার্জিলিং-এর জল অত্যন্ত মৃদু জল। খরজল ফোটালে যে গাদ পড়ে তার ফলে খরতা কতকটা কমে যায়। উপযুক্ত মাত্রায় চুন, সোডা প্রভৃতির যোগে এবং অন্যান্য রাসায়নিক প্রক্রিয়ায় খরজলকে মৃদু করা যায়।

গঙ্গা প্রভৃতি হিমালয় জাত নদীর জল মোটের উপর মৃদু। কলকাতার কলের জলেরও খরতা কম। মোহানার কাছে নদীতে সমুদ্রের জোয়ারের জল আসায় নুন এবং খরতা বাড়ে, সেজন্য কলকাতার দক্ষিণে গঙ্গার জল বিস্বাদ। কলকাতার প্রায় ১৮ মাইল উত্তরে পলতা নামক স্থানে গঙ্গা থেকে শহরের জন্য জল সংগ্রহ করা হয়।

মাটির আর একটি অতি সাধারণ উপাদান লোহা, এই লোহা অক্সিজেন সংযোগে ফেরিক বা ফেরস অক্সাইড রূপে থাকে। ফেরস অক্সাইড অঙ্গারাম্ল যুক্ত জলে দ্রব হয় না, কিন্তু ফেরিক অক্সাইড বা হাইড্রক্সাইড হয় না। বাংলা দেশের অনেক স্থানে পাতকুয়ো বা নলকূপের জল তোলবার সময় পরিষ্কার থাকে, কিন্তু হাওয়া লাগলে উপরে সর পড়ে এবং তা থিতিয়ে লালচে বা হলদে গাদ হয়ে জমে। এই পরিবর্তনের কারণ অঙ্গারাম্ল উঠে হাওয়ায় ফেরস অক্সাইড অদ্রাব্য হয় এবং বায়ুর অক্সিজেন যোগে তা ফেরিক হাইড্রক্সাইডে পরিণত হয়। এই রকম জলে কাপড় কাচলে ক্রমশঃ তাতে গেরুয়া রং ধরে।

ভূমিতে যদি বালি, নুড়ি, কাঁকর প্রভৃতি বেশী থাকে তবে তার ভিতর দিয়ে সহজেই জল প্রবেশ করে এবং নীচে নামতে থাকে। এঁটেল

মাটির স্তর এবং নিরেট পাথর অপ্রবেশ্য। তাদের ভিতর জল যায় না। ভূমির নীচে যেখানে অপ্রবেশ্য স্তর থাকে সেইখানে জলের অধোগতি থামে এবং তার উপরে বালি প্রভৃতির প্রবেশ্য স্তরে জল জমতে থাকে বর্ষা শেষ হলে মাটি উপর থেকে শুকতে আরম্ভ করে, তার ফলে নীচে সঞ্চিত জলের ঊর্ধ্বসীমা বা খাড়াই ক্রমশঃ নামতে থাকে এবং অনেক স্থানে গ্রীষ্মকালে একেবারে লুপ্ত হয়।

যে অঞ্চলে বৃষ্টি কম এবং বালি প্রভৃতির স্তর উপর থেকে অনেক নীচে পর্যন্ত নেমে গেছে সেখানে খুব গভীর কুয়ো করতে হয়। নিম্ন বঙ্গের অনেক স্থানে যেমন কলকাতার আশে পাশে, মাটির ৩/৪ হাত নীচেই জল পাওয়া যায়, এবং গ্রীষ্মকালেও তা খুব নীচে নামে না। তার কারণ—এই স্থানে বৃষ্টি বেশী, এবং প্রবেশ্য স্তরও খুব গভীর নয়, অনেক জায়গায় ৫০/৬০ ফুট নীচেই অপ্রবেশ্য এঁটেল মাটির স্তর। কিন্তু অপ্রবেশ্য স্তরের নীচেও আবার প্রবেশ্য স্তর পাওয়া যায় এবং তাতেও দূরবর্তী স্থান থেকে জল এসে জমা হয়। বাংলা দেশের অনেক স্থানে এবং অন্য প্রদেশেও পর্যায়ক্রমে প্রবেশ্য ও অপ্রবেশ্য স্তরের বিন্যাস দেখা যায় এবং সব প্রবেশ্য স্তরের জলও সমান নয়। উপরের জল সাধারণতঃ মৃদু ও জীবাণু পুষ্ট। তার নীচের জল জীবাণুশূন্য কিন্তু খর আর নোনা হতে পারে। আরও নীচের জল হয়তো নির্দোষ। নলকূপ বসাবার সময় উপযুক্ত স্তর নির্বাচন একটি কঠিন কাজ। নদীর জলের চেয়ে কুয়ো এবং নলকূপের জল সাধারণতঃ খর।

ভারতবর্ষে অনেক স্থানে উৎস (spring) আছে, তাদের কতকগুলি থেকে গরম জল বার হয়, আবার কতকগুলির জলে নানা রকম রাসায়নিক পদার্থ মিশ্রিত থাকে। মুঙ্গেরের কাছে সীতাকুণ্ড পঞ্জাবের কুলু অঞ্চলে মণিকর্ণ, কাংড়ায় জ্বালামুখী, জম্বুর অন্তর্গত পুঞ্চে তাত্তাপানি, গঙ্গোত্তরী প্রদেশে, বিহারে রাজগীরে, বীরভূম জেলায় বক্রেশ্বরে, বোম্বাই প্রদেশে থানা জেলায় এবং আরও নানা স্থানে উষ্ণ প্রস্রবণ আছে। কতকগুলির জল এত গরম যে তীর্থ যাত্রীরা তাতে ভাত সিদ্ধ করে, যেমন কুলুর মণিকর্ণ, কাংড়ায় জ্বালামুখীর জলে ক্রোমাইড ও

আয়োডাইও আছে। কতকগুলির জলে গন্ধক আছে, যেমন বক্রেশ্বর, তান্ত্রাপানি এবং থানার প্রস্রবণ। উড়িষ্যায় ভুবনেশ্বরে দুধকুণ্ড উৎসের জল সাদা, তাতে সম্ভবতঃ Colloidal kaolin আছে। বোম্বাই প্রদেশের পাঁচ মহল অঞ্চলে তুবা নামক স্থানের উৎস জল তেজস্ক্রিয়।

ভারতবর্ষে উৎসের অভাব নেই কিন্তু অধিকাংশের জলের উপাদান ও ভেষজ গুণ এখনও নির্ণীত হয়নি। খুব কম লোকেই চিকিৎসার জন্য উৎস জল ব্যবহার করে। এদেশে উৎস জলের আদর তীর্থ জল হিসাবে।

॥ অনুশীলনী ॥

১. জল বাষ্পীভূত হবার পর কিসে কিসে রূপান্তর লাভ করে?

২. সমুদ্রের জলে কি কি উপাদান আছে? ক্যালসিয়াম কার্বোনেট কিসের দ্বারা গঠিত? এই কার্বোনেট কিসে তৈরী হয় এবং কিভাবে জলে গলে?

৩. খরজল ও মৃদুজল কাকে বলে? কিভাবে খরজল মৃদুজলে পরিণত হয়? কোথাকার জল খর এবং কোথাকার জল মৃদু? কলকাতার দক্ষিণে গঙ্গার জল বিস্বাদ কেন?

৪. লোহা কিভাবে থাকে? কুয়োর জল থিতিয়ে গেলে লাল হয় কেন? জল কিভাবে মাটির ভিতর প্রবেশ করে, কিভাবে করে না?

৫. "নলকূপ বসাবার সময় উপযুক্ত স্তর নির্বাচন একটি কঠিন কাজ।"—কেন?

৬. ভারতবর্ষের কোথায় কোথায় প্রস্রবণ [Spring] দেখতে পাওয়া যায়? এই প্রস্রবণগুলির কোন্‌টায় কি আছে বিবৃত কর।

৭. 'এদেশে উৎস জলের আদর তীর্থ জল হিসেবে'—কেন?

৮. অর্থ লিখ :

বিশাল, উৎপত্তি, নিরন্তর, প্রক্রিয়া, খরতা, বিস্বাদ, দ্রবীভূত, অদ্রাব্য, অধোগতি, ঊর্ধসীমা, বিন্যাস, প্রস্রবণ, তেজস্ক্রিয়া, বাষ্পীভূত।

৯. বাক্য রচনা কর :

উপাদান, শোষিত, প্রাচীন, ক্ষয়, উপযুক্ত, সংযোগ, স্তর, দূরবর্তী, জীবাণু, নির্দোষ, পদার্থ, উৎস, আদর, নির্বাচন।

১০. পদ পরিবর্তন কর :

সূর্য, গঙ্গা, মাটি, শোষিত, ক্ষয়, দ্রব, খর, সংযোগ, ভূমি, লক্ষিত; লুপ্ত, গভীর, প্রবেশ্য, নির্বাচন, অঞ্চল, জল।

Highly technical writing on

বিদ্যাসাগর



[এই অংশটি 'বিদ্যাসাগর' নামক নাট্যগ্রন্থ থেকে সংকলিত। নাট্যকার ডাক্তার-সাহিত্যিক। সাহিত্য জগতে ইনি 'বনফুল' নামে পরিচিত। এ অংশে বিদ্যাসাগরের অসামান্য মাতৃভক্তির স্বরূপটি পরিস্ফুট হয়েছে।]

প্রথম দৃশ্য

[মার্শাল সাহেবের অফিস। সাহেব টেবিলে বসিয়া কাজ করিতেছেন। বিদ্যাসাগর আসিয়া প্রবেশ করিলেন। পায়ে চটি, গায়ে সাদা চাদর। সাহেব সসম্ভ্রমে তাঁহাকে সংবর্ধনা করিলেন। সাহেব বাংলা শিখিয়াছেন, শুদ্ধ কেতাবী বাংলা বলেন, ক্রিয়াপদও প্রায় সবই কেতাবী, কখনও চলিত। দ স্থানে ড এবং ত স্থানে ট প্রভৃতি উচ্চারণেরও দোষ আছে।]

বিদ্যাসাগর। আমি আপনার কাছে একটা অনুরোধ নিয়ে এসেছি।

মার্শাল। কি বলুন ?

বিদ্যাসাগর। ছুটি চাই। আমার ভাইয়ের বিয়ে, মা বাড়ী যেতে লিখেছেন।

মার্শাল। ছুটি ? কত দিনের ?

বিদ্যাসাগর। অন্ততঃ তিন চারদিনের।

মার্শাল। তাহা তো এখন অসম্ভব ; কলেজের কাজকর্ম চলিবে কিরূপে ?

[বিদ্যাসাগর চুপ করিয়া রহিলেন]

বিদ্যাসাগর। কিন্তু আমাকে যেতেই হবে। বিয়ে ছাড়া আমার নিজেরও একটু দরকার আছে বাবা-মায়ের কাছে।

মার্শাল। খুব জরুরি ?

বিদ্যাসাগর। হ্যাঁ, খুব জরুরি, তাঁদের জিজ্ঞাসা না করা পর্যন্ত আমি একটা কাজে হাত দিতে পারছি না।

মার্শাল। [বিস্মিত] আপনি কি এখনও সকল কার্য তাঁহাদের অনুমতি অনুসারে করেন ?

বিদ্যাসাগর। সকল কার্য করি না বটে, কিন্তু এ কাজটিতে হাত দেবার আগে আমি তাদের পরামর্শ নিতে চাই।

মার্শাল। কি এমন কাজ।

বিদ্যাসাগর। বিধবা বিবাহ। মা বাবা যদি আপত্তি না করেন তাহলে এ নিয়ে আন্দোলন করব আমি। বিধবা-বিবাহের শাস্ত্রীয় প্রমাণাদি আমি আগেই বাবার কাছে লিখে পাঠিয়েছি। তিনি এখনও উত্তর দেননি।

মার্শাল। আপনার এ চেষ্টা খুবই প্রশংসাযোগ্য। কিন্তু ডাক-যোগেই তো আপনি তাঁদের উত্তর পেতে পারবেন।

বিদ্যাসাগর। আমি এর জন্য ছুটি চাইছি না। আমার ভাইয়ের বিয়ে, সেইজন্যই ছুটি চাইছি।

মার্শাল। আমি খুবই দুঃখিত, ছুটি দেওয়া এখন চলবে না, কাজের বড়ই ক্ষতি হবে।

[বাহিরে ঢং ঢং করিয়া ঘণ্টা বাজিল। বিদ্যাসাগর উঠিলেন।]

বিদ্যাসাগর। ক্লাসের ঘণ্টা পড়ল। উঠি তা হলে।

মার্শাল। আচ্ছা, আমি খুবই দুঃখিত, পণ্ডিত।

[বিদ্যাসাগর চলিয়া গেলেন, মার্শাল সাহেব অফিসের কাজকর্ম করিতে লাগিলেন। সহসা বিদ্যাসাগর আবার প্রবেশ করিলেন।]

বিদ্যাসাগর। আমি ভেবে দেখলাম আমাকে যেতেই হবে।

মার্শাল। ছুটি না দিলেও যাবেন ?

বিদ্যাসাগর। হ্যাঁ, চাকরি ছেড়ে দিয়ে যাবো।

মার্শাল। কি মুশকিল, তাহা হইলে তো ছুটি দিতেই হয় [হাসিয়া] কলেজের কাজ অপেক্ষা বিবাহের নিমন্ত্রণটাই আপনার নিকট বড় হইল।

বিদ্যাসাগর। নিমন্ত্রণ বড় নয়, মা ডেকেছেন সেইটেই বড়। যে সন্তান মায়ের আদেশ পালন না করতে পারে সে নরাধম।

[চলিয়া গেলেন]

দ্বিতীয় দৃশ্য

[দামোদর তীরে একটি খেয়া ঘাট, ঘাটের নিকটে একটি কুটীর রহিয়াছে, চতুর্দিক অন্ধকার, সন্ধ্যা উত্তীর্ণ হইয়া গিয়াছে। আকাশ ঘন ঘটাচ্ছন্ন, প্রবল বায়ু বহিতেছে। বায়ুবেগে উত্তাল তরঙ্গ-সমাকুল দামোদরের গর্জন শোনা যাইতেছে। জনপ্রাণী কেহ নাই, দ্রুতপদে বিদ্যাসাগর আসিয়া প্রবেশ করিলেন, তাহার পর দাঁড়াইয়া এদিক ওদিক নিরীক্ষণ করিতে লাগিলেন।]

বিদ্যাসাগর। কেউ কোথাও নেই দেখছি। [কুটীর দেখিতে পাইয়া সেদিকে গেলেন।] মাঝি, মাঝি, এরা সব কোথা ? মাঝি !

[ঝাঁপ খুলিয়া লোক বাহির হইল।]

লোক। মাঝি ফিরতে পারেনি, মেঘ দেখছেন ?

বিদ্যাসাগর। তা তো দেখছি, কিন্তু আমাকে এখুনি পেরুতে হবে যে

লোক। নৌকা নৈলে যাবেন কিসে চেপে ? ওপার থেকে নৌকাই তো আসে না। আর এমন ঝড়ে নৌকাই বা আসে কি করে ? মেঘ দেখছেন, দামোদরের ডাক শুনছেন ?

বিদ্যাসাগর। সব শুনছি। কিন্তু আমাকে পেরুতেই হবে।

লোক। মাঝি নৌকা নিয়ে ফিরলে তবে না পার হবেন, সে আজ আর ফিরছে না।

[বিদ্যাসাগর চাদরটি কোমরে বাঁধিলেন এবং ঘাটে নামিয়া গেলেন, লোকটি সবিস্ময়ে দাঁড়াইয়া দেখিতে লাগিল।]

লোক। ওই পাগল বটে নাকি!

[ঝপাৎ করিয়া একটা শব্দ হইল।]

তৃতীয় দৃশ্য

[বীরসিংহে বিদ্যাসাগর মহাশয়ের বাটীর অভ্যন্তর। রাত্রি গভীর, চারিদিক নিষুপ্ত, কপাট জানালা সব বন্ধ। একটি ঘরের বাতায়ন দিয়া ক্ষীণ একটি আলোর রেখা দেখা যাইতেছে।]

(নেপথ্যে) বিদ্যাসাগর। মা, মা!

[যে ঘরের জানালা দিয়া আলোক দেখা যাইতেছিল, সেই ঘরের কপাট সঙ্গে সঙ্গে খুলিয়া গেল, প্রদীপ হস্তে বিদ্যাসাগর জননী ভগবতী দেবী বাহির হইয়া আসিলেন, তিনি যেন জাগিয়াছিলেন।]

ভগবতী। ঈশ্বর, এলি বাবা? [আগাইয়া গিয়া বাহিরের কপাট খুলিতে খুলিতে] আমি জেগেই ছিলাম। আয় বাবা, আয়। বড় রাত করলি যে, সব তোর অপেক্ষায় থেকে থেকে চলে গেল। [কপাট খুলিয়া দিতেই বিদ্যাসাগর প্রবেশ করিলেন। তাঁহার কাপড় ভিজা, স্থানে স্থানে কাদা লাগিয়া রহিয়াছে। ভগবতী দেবী বিস্মিত হইয়া গেলেন।] এ কি!

[বিদ্যাসাগর প্রণাম করিলেন।]

বিদ্যাসাগর। (হাসিয়া) দামোদরের ঘাটে মাঝি ছিল না, সাঁতরেই চলে এলাম।

ভগবতী। পাগল ছেলের কাণ্ড দেখ দেখি। আয় কাপড় ছাড়, মাথাটা মোছ আগে।

।। অনুশীলনী ।।

১. 'বিদ্যাসাগর' নাট্যাংশটিতে বিদ্যাসাগরের চরিত্রের যে পরিচয়টুকু পাওয়া যায় তা তোমার নিজের ভাষায় লিখ।

২. মার্শাল সাহেবের সঙ্গে বিদ্যাসাগরের কথোপকথনের সারমর্ম লেখ।

৩. 'তিনি এখনও উত্তর দেননি'—'তিনি' কে? কিসের উত্তর দেননি? এখানে বক্তার কী পরিচয় ফুটে উঠেছে?

৪. 'আমি ভেবে দেখলাম আমাকে যেতেই হবে।'—বক্তা কে? তিনি কি কথা বলতে চেয়েছেন? সেই কথার মধ্যে বক্তার কোন্ মনোভাবের পরিচয় পাওয়া যায়?

৫. 'পাগল ছেলের কাণ্ড দেখ দেখি'—'পাগল ছেলেটি' কে? কে এই কথা বলেছিল? পাগল ছেলেটি কি কাণ্ড করেছিল এবং কেন করেছিল?

৬. 'আমি আপনার কাছে একটা অনুরোধ নিয়ে এসেছি'—কে কার কাছে অনুরোধ করেছে? অনুরোধটি কি? এই অনুরোধ প্রত্যাখ্যাত হয়েছিল কেন? শেষ পর্যন্ত এর ফল কি হয়েছিল?

৭. 'নিমন্ত্রণ বড় নয়; মা ডেকেছেন সেইটেই বড়। যে সন্তান মায়ের আদেশ পালন না করতে পারে সে নরাধম'—উক্তিটি কার? কেন তিনি একথা বললেন? উদ্ধৃতিটির মূল অর্থটি পরিস্ফুট কর।

৮. অর্থ লিখ:

সংবর্ধনা কেতাবী, প্রশংসাযোগ্য, ঘটাচ্ছন্ন, উত্তাল, তরঙ্গসমাকুল, নিরীক্ষণ, সবিস্ময়ে, অভ্যন্তর, নিযুক্ত, বাতায়ন।

৯. বাক্য রচনা কর:

কাজকর্ম, অনুমতি, বিদ্যাসাগর, অসম্ভব, ক্ষতি, নরাধম, সবিস্ময়ে, বিস্মিত, কাণ্ড, অভ্যন্তর।

Personality, courage, ~~straight forwardness~~ devotion to mother etc — Some salient features of vidyasagara's Character are nicely displayed here.

চড়ুইভাতি



বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়

[বিভূতিভূষণ কথা সাহিত্যিক, তিনি বহু উপন্যাস ও ছোট গল্পের সার্থক রচয়িতা। উদ্ধৃতাংশটি তাঁরই রচিত 'পথের পাঁচালী' উপন্যাসের একটি চিত্র। ছোট খাট তুচ্ছ জিনিষের মধ্যেও যে কি অপার্থিব আনন্দ লুকিয়ে আছে এই অংশটি তারই দৃষ্টান্তস্বরূপ।]

সেদিন তাহার দিদি চুপি চুপি বলে—চড়ুই ভাতি করবি অপু ?

নীলমণি রায়ের জঙ্গলাকীর্ণ ভিটার ওধারের খানিকটা বন দুর্গা নিজের হাতে দা দিয়া কাটিয়া পরিষ্কার করিয়া ভাইকে বলিল—দাঁড়িয়ে ছাখ্, তেঁতুল তলায় মা আসচে কিনা—আমি চাল বের করে নিয়ে আসি শীগ্‌গির ক'রে—

একটা ভালো নারিকেলের মালায় দুই পলা তেল সে চুপি চুপি তেলের ভাঁড়টা হইতে বাহির করিয়া আনিল। অপহৃত মালা বাহিরে ভাইয়ের জিম্মা করিয়া বলিল—শীগ্‌গির নিয়ে যা, দৌড়ে অপু—সেইখানেই রেখে আয়। দেখিস যেন গোরু-টোরুতে খেয়ে ফেলে না—দুজনে জিনিষ পত্র লইয়া চলিল।

চারিদিক বনে ঘেরা, বাহির হইতে দেখা যায় না। খেলা ঘরের মাটির ছোবার মত ছোট একটা হাঁড়িতে দুর্গা ভাত চড়াইয়া দিয়া বলিল—এই ছাখ্, অপু, কত বড বড় মেটে আলুর ফল নিয়ে এসেচি এক জায়গা থেকে। পুঁটিদের তালতলায় একটা ঝোপের মধ্যে অনেক ধরে আছে ভাতে দেবো...

অপু মহা উৎসাহে শুক্‌না লতা-কাঠি কুড়াইয়া আনে। এই তাহাদের প্রথম বনভোজন। অপুর এখনও বিশ্বাস হইতেছিল না যে, এখানে সত্যিকারের ভাত তরকারি রান্না হইবে। খেলাঘরের বনভোজন, যাহা কতবার হইয়াছে, বুঝি সেই রকম হইবে,—ধুলার ভাত, খাপরার আলু ভাজা, কাঁটালপাতার লুচি।

কিন্তু বড় সুন্দর বেলাটি।—বড় সুন্দর স্থান বনভোজনের! চারিধারে বন ঝোপ, ওদিকে তেলাকুচা লতার ঝুলুনি, বেলগাছের তলে জঙ্গলে ফুলের ঝাড়, ঘাসের উপরে খঞ্জন পাখিরা নাচিয়া নাচিয়া ছুটিয়া বেড়াইতেছে, নির্জন ঝোপ-ঝাপের আড়ালে নিভৃত নিরালা স্থানটি। প্রথম বসন্তের দিনে ঝোপে ঝোপে নূতন কচি পাতা, ঘেঁটুফুলের ঝাড় পোড়ো ভিটেটা আলো করিয়া ফুটিয়া আছে, বাতাবি-লেবুর গাছটায় কদিনের কুয়াশায় ফুল অনেক ঝরিয়া গেলেও থোকা থোকা শাদা শাদা ফুল উপরের ডালে চোখে পড়ে।

চড়ুইভাতির মাঝামাঝি অপূদের বাড়ীর উঠানে কাহার ডাক শোনা গেল। দুর্গা বলিল—বিনির গলা যেন—নিয়ে আয় তো ডেকে অপু। একটু পরে অপুর পিছনে পিছনে দুর্গার সমবয়সা একটি কালো মেয়ে আসিল—একটু হাসিয়া যেন কতকটা সম্ভ্রমের সুরে বলিল—কি হচ্ছে দুগ্‌গা দিদি?

দুর্গা বলিল—আয় না বিনি, চড়ুইভাতি কচ্চি—বোস—

মেয়েটি ও পাড়ার কালীনাথ চক্কোত্তির মেয়ে—পরণে আধ-ময়লা শাড়ী, হাতে সরু সরু কাঁচের চুড়ি, লম্বা গড়ন, নিতান্ত সাদাসিধা। বিনি দুর্গার ফরমাইস খাটিতে লাগিল খুব। বেড়াইতে আসিয়া হঠাৎ সে যেন একটা লাভজনক ব্যাপারের মধ্যে আসিয়া পড়িয়াছে, এখন ইহারা তাহাকে সে উৎসবের অংশীদার স্বীকার করিবে কি না করিবে—এরূপ একটা দ্বিধা মিশ্রিত উল্লাসের ভাব তাহার কথাবার্তায় ভাবভঙ্গিতে প্রকাশ পাইতেছিল। দুর্গা বলিল—বিনি, আর দুটো শুক্‌নো কাঠ দ্যাখতো—আগুনটা জ্বলবে না ভাল—

বিনি তখনই কাঠ আনিতে ছুটিল এবং একটু পরে এক বোঝা শুক্‌নো বেলের ডাল আনিয়া হাজির করিয়া বলিল—এতে হবে দুগ্‌গা দিদি—না, আর আনবো ?···দুর্গা যখন বলিল—বিনি এসেচে—ও-ও তো এখানে খাবে—আর দুটো চাল নিয়ে আয় অপু—বিনির মুখখানা তখনি খুশীতে উজ্জ্বল হইয়া উঠিল। খানিকটা পরে বিনি জল আনিয়া দিল। আগ্রহের সুরে জিজ্ঞাসা করিল—কি কি তরকারি দুগ্‌গা দিদি ?

ভাত নামাইয়া দুর্গা তেলটুকু দিয়া বেগুন ভাজে। খানিকটা পরে সে অবাক হইয়া ছোবার দিকে চাহিয়া থাকে, অপুকে ডাকিয়া বলে—ঠিক একেবারে সত্যিকারের বেগুন ভাজার মত রঙ হচ্ছে দেখচিস্ অপু ! ঠিক যেন মার রান্নার বেগুন ভাজা, না ?

অপুর ব্যাপারটা আশ্চর্য বোধ হয়। তাহারও এতক্ষণ যেন বিশ্বাস হইতেছিল না যে, তাহাদের বনভোজনে সত্যকার ভাত, সত্যকার বেগুন-ভাজা সম্ভবপর হইবে। তাহার পর দুজনে মহা আনন্দে কলার পাতে খাইতে বসে, শুধু ভাত আর বেগুন ভাজা। অপু গ্রাস মুখে তুলিবার সময়ে দুর্গা সেদিকে চাহিয়া আগ্রহের সঙ্গে জিজ্ঞাসা করে,—কেমন হয়েছে রে বেগুন ভাজা ?

অপু বলে,—বেশ হয়েছে দিদি, কিন্তু নুন হয়নি যেন—

লবণকে রন্ধনের উপকরণের তালিকা হইতে ইহারা একেবারে বাদ দিয়াছে, লবণের বালাই রাখে নাই। কিন্তু মহাখুশীতেই তিন জনে কোষো আলুর ফল ভাতে ও পানসে আধপোড়া বেগুন ভাজা দিয়া চড়ুই ভাতির ভাত খাইতে বসিল। দুর্গার এই প্রথম রান্না, সে বিস্ময় মিশানো আনন্দের সঙ্গে নিজের হাতের শিল্পসৃষ্টি উপভোগ করিতেছিল। এই বনঝোপের মধ্যে এই শুক্‌না আতা-পাতার রাশের মধ্যে, খেজুর তলায় ঝরিয়া-পড়া খেজুর পাতার পাশে বসিয়া সত্যিকারের ভাত-তরকারি খাওয়া।

Little boys and girls can discover pleasure in trifling matters

।। অনুশীলনী ।।

১. অপুদের চড়ুইভাতির পরিবেশটি বর্ণনা কর।

২. অপু ও দুর্গা কোথায় বনভোজন করেছিল? তাদের আয়োজনটি কিরূপ ছিল? পরে বনভোজনে কে যোগ দিল এবং তার চেহারাটি কিরূপ?

৩. 'অপুর ব্যাপারটা আশ্চর্য বোধ হয়'—কোন্ ব্যাপারটা? সে ঐ ব্যাপারে আশ্চর্য হোল কেন? সত্যই কি আশ্চর্যের কিছু ছিল?

৪. 'এই তাহাদের প্রথম বনভোজন'—কাদের বনভোজন? কেন এটা প্রথম বনভোজন? বনভোজনের আয়োজনটি বর্ণনা কর। বনভোজন সম্পর্কে অপুর ধারণাটি কি ছিল?

৫. 'বড় সুন্দর স্থান বনভোজনের'—'বনভোজন' কাকে বলে? বনভোজনের স্থানটির একটি বিবরণ দাও।

৬. 'নিয়ে আয় তো ডেকে অপু'—কে কাকে ডাকতে বলল? যাকে ডাকতে বলল তার পরিচয়টা কি? চেহারাটা কেমন? সে বনভোজনে কী সাহায্য করেছিল?

৭. 'সে বিস্ময় মিশানো আনন্দের সঙ্গে নিজের হাতের শিল্পসৃষ্টি উপভোগ করিতেছিল'—'সে' কে? তার মনের মধ্যে কোন্ ভাবটি জেগেছিল? উদ্ধৃতিটির মূল ভাবটি ব্যক্ত কর।

৮. অর্থ লিখ:

জঙ্গলাকীর্ণ, নিভৃত, নিরালা, অপহৃত, খঞ্জন, সাদাসিধা, উল্লাসে, দ্বিধামিশ্রিত, বিস্ময়মিশানো, উপকরণ, চড়ুইভাতি।



স্বর্গদ্বার পরিক্রমা

— রাণী চন্দ

[‘পূর্ণকুম্ভ’ ভ্রমণাত্মক উপন্যাস থেকে নীচের নিবন্ধটি গৃহীত হল। চলিত ভাষায় লেখা, এই নিবন্ধে ভ্রমণ কাহিনীর সঙ্গে পৌরাণিক কথা বিশেষ এক আবেদন সৃষ্টি করেছে। চলতি পথের ছোট ছোট বর্ণনার মধ্যে শ্রীমতী চন্দের অপূর্ব মননশীলতার পরিচয় মেলে।]

গঙ্গার পাড়ে গাড়ী থামল, এ পারের নাম রামতীর্থ, ও পার স্বর্গদ্বার। রাম সাধু পাঞ্জাবী ছিলেন, অল্প বয়সে সিদ্ধিলাভ করেন। শিষ্যের দল বাড়তে থাকে একের পর এক, ঘিরে থাকে সারাক্ষণ গুরুকে। গুরুর ভালো লাগে না লোকের সঙ্গ, তিনি চান আপন মনে থাকতে, সম্ভব হয় না। শেষে একদিন সেই অল্প বয়সেই এখানকার উঁচু পাহাড় হতে গঙ্গায় ঝাঁপিয়ে পড়েন। তার বহু পরে এখানে কেউ ঘাট বাঁধিয়ে দেয়। রাম সাধুর স্মৃতি জড়িয়ে তাই এর নাম রামতীর্থ **

খেয়া পার হয়ে এলাম স্বর্গদ্বারে। যুধিষ্ঠিররা পঞ্চপাণ্ডব দ্রৌপদীকে নিয়ে স্বর্গের পথে রওনা হয়েছিলেন এই স্বর্গদ্বার হতেই। বড়দি বললেন, ‘এমন পবিত্র স্থান, তা ছাড়া পৃথিবীর মাটির সঙ্গে গঙ্গার সর্বপ্রথম যোগ এই পুণ্যভূমিতে, এখানে একটা ডুব না দিলে চলে?’

সত্যিই কী রূপ এখানে গঙ্গার! হাসি-উল্লাসের অন্ত নেই তার, সবুজে-নীল জলধারা বেগে ছুটে চলেছে—উদ্দাম গতি, উচ্ছলিত ভঙ্গি। যেন সেই সর্বনাশা প্রেমের ডাক শুনতে পেয়েছে কানে, যে ডাকের তাড়নায় কুলের বধূ বেরিয়ে পড়ে কলঙ্ক-ভয় ভুলে।

স্নান করে উঠি স্বর্গদ্বারের বাঁধানো ঘাটে। ঘাটের এক পাশে শিবমন্দির, অন্যপাশে নারায়ণের। শিবের মাথায় জল ঢেলে প্রসাদী কুমকুম্ কপালে লেপে এলাম নারায়ণের কাছে। শ্বেত পাথরের নারায়ণ বসে আছেন যেন ধ্যানী বুদ্ধদেব; তেমনি ভঙ্গি, নতুন ধরণ, মুখের গড়নখানা সুন্দর।

চারদিকের উঁচু নীল পাহাড়ের সারি, মনে হয় কত হাল্কা, এখুনি যেন উড়ে গিয়ে মিশতে পারে নীল আকাশের গায়ে, জলে স্থলে আকাশে নীলের ছড়াছড়ি। যেন নিঃশেষে উজাড় করে ঢেলে দিয়েছে এখানে সবটুকু। এত নীলের বাহার—মনকে স্তব্ধ আকুল করে তোলে।

'তুমি এখানে কেন? আর আমরা কত খুঁজে মরছি।' দেখি দাদা সামনে দাঁড়িয়ে, বললেন 'ওদিকে খানিক এগিয়ে গীতাভবন, দেখবার মতো, দেখে এসো গিয়ে, আমরা এই দেখে এলাম।'

গঙ্গার ওপার হতেই দেখেছিলাম, বিরাট এক লাল প্রাসাদ, প্রশস্ত বাঁধানো ঘাটের উপর, সেই প্রাসাদই গীতাভবন। কাছে এসে দেখি গীতাভবনের সারা গা ছাওয়া, খোদাই ক'রে লেখা পুরো গীতাখানা। লাল সিমেন্টের দেওয়ালে সাদা রঙে ভরা খোদাই সংস্কৃত শ্লোকগুলি—চমৎকার এক বাহার দিয়েছে। মানানসই ভাগে ভাগ করা লেখাগুলি, উপর-নীচ আগাগোড়া, দূর থেকে অদ্ভুত একটা এফেকট্ দেয়। মনে হয়, না জানি কত কারুকাজ বাড়ির গায়ে। ভেবেও ছিলাম তাই ওপার হতে।

সামনে লম্বা ঢাকা বারান্দার দেয়ালে পরপর একসার রঙিন ছবি, গীতার ব্যাখ্যা দেওয়া, টিনের পাতলা পাতের উপর তেলেরঙ দিয়ে আঁকা। আঁকার কাজ চলছে এখনও। **

পাহাড়ের গা বেয়ে পাথর নুড়ি মাড়িয়ে চলতে লাগলাম উঁচু নীচু রাস্তা ধরে। পাকা গাঁথনির ছোট্ট ছোট্ট বহু কুঠিয়া স্বর্গদ্বারে। হৃষীকেশের চেয়ে স্বর্গদ্বার আরও বেশি নির্জন। লোকজনের বসতি নেই বললেই চলে। একান্তে যাঁরা সাধনা করতে চান তাঁরাই কেবল থাকেন

এখানে। বাবা কালী কম্‌লেওয়ালা একশো খানা পাক্কা কুঠিয়া তৈরী করে দিয়েছিলেন এখানে। পাক্কা কুঠিয়া মানে—খুপরি একখানা ঘর, কোনমতে শোওয়া-বসা যায়। অবশ্য যাঁদের গুহাগহ্বরে বসে তপস্যা করতে হয় তাঁদের পক্ষে এর চেয়ে বড়ো ঘরের কীই-বা প্রয়োজন। যেতে যেতে কত ধ্যানমগ্ন সাধু নজরে পড়ল। কেউ অন্ধকার ঘরে বসে, কেউ-বা সামনে ধুনি জ্বালিয়ে। বড়ো বড়ো পুরানো গাছে ঢাকা কুঠিয়া, আম বাগানের ফাঁকে ফাঁকে সাধুর কুঠির—যেন বইয়ে পড়া তপোবনের মুনি ঋষিদের আশ্রম, যেন বনবাসে সীতার ঘরকন্না সুন্দর পরিচ্ছন্ন আঙিনা. ত্রিশূল ডমরু ঝুলছে ডালে, সাধুরা কেউ ঝরণার নালায় খাবার পাত্রখানা মেজে ধুয়ে রাখছেন, কেউ গঙ্গা হতে জল তুলে আনছেন, কেউ ছোট দাওয়াটুকুতে বসে আপন মনে গুন্‌গুন্ নাম গাইছেন। এ এক আলাদা জগৎ, কোন্ সুখের ইশারা পেয়ে সোনার সংসার ঝেড়ে ফেলে এখানে এসে এই ধুলির সংসার পেতে মগ্ন হয়ে আছেন সবাই—ভাবনা জাগে মনে। (সংক্ষেপিত)

॥ অনুশীলনী ॥

১. স্বর্গদ্বার কেমন? কারা এই পথে স্বর্গে গিয়েছিলেন? স্বর্গদ্বারের বর্ণনা দাও।

২. 'রামতীর্থ' কোথায়? কেন ঐ স্থানের নাম 'রামতীর্থ' হয়েছে?

৩. গঙ্গার রূপ-সৌন্দর্য বর্ণনা কর।

৪. গীতাভবনটির আনুপূর্বিক বিবরণ দাও।

৫. স্বর্গদ্বারের পথের কুঠিয়াবাসীদের পরিচয় দাও। কুঠিয়া কি?

৬. অর্থ লিখ: স্মৃতি, পুণ্যভূমি, উল্লাস, উদ্দাম, উচ্ছলিত, প্রনাদী, ধ্যানী, বাহার, স্তব্ধ, কারুকাজ, সিদ্ধিলাভ।

৭. সাধুভাষায় লিখ:

কাছে এসে দেখি গীতাভবনের সারা গা ছাওয়া, খোদাই করে লেখা পুরো গীতাখানা। লাল সিমেন্টের দেওয়ালে সাদা রঙে ভরা খোদাই সংস্কৃত শ্লোকগুলি—চমৎকার এক বাহার দিয়েছে।

A nice description of a sacred



বাংলার বাঘ: আশুতোষ

—রবিদাস সাহারায়

[আশুতোষের জন্ম হয় ১৮৬৪, ২৯শে জুন, মৃত্যু হয় ১৯২৪, ২৪শে মে। পরাধীন ভারতে পরাধীন জাতির মধ্যে জন্মগ্রহণ করে যে সব মহাপুরুষ নিজস্ব ব্যক্তিত্ব, তেজ ও নির্ভীকতার পরিচয় দিয়েছেন স্যার আশুতোষ মুখোপাধ্যায় তাঁদের মধ্যে অন্যতম। বাংলার শিক্ষা জগতে তাঁর দান অপরিসীম।]

পরাধীন ভারতে পরাধীন জাতির মধ্যে জন্মগ্রহণ করে আশুতোষ যে ব্যক্তিত্ব, তেজ ও নির্ভীকতার পরিচয় দিয়ে গেছেন, সত্যি তার তুলনা হয় না।

আশুতোষ মুখোপাধ্যায়ের পিতা গঙ্গাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায় ছিলেন একজন লব্ধপ্রতিষ্ঠ চিকিৎসক। পুত্রের ভাবী জীবন গঠনের প্রতি ছিল তাঁর প্রখর দৃষ্টি। বাড়ীতে প্রথম ভাগ শেষ করার পর আশুতোষকে চক্রবেড়িয়া শিশু বিদ্যালয়ে ভর্তি করেছিলেন। পাঁচ বছরের বালক প্রথম দিন বিদ্যালয়ে গিয়েই আর যেতে সম্মত হলো না। পিতা তার কারণ জিজ্ঞাসা করতেই বালক জবাব দিলো—'ও তো স্কুল নয়, ও যে যাত্রা, ওখানে গিয়ে কি হবে?'

শৈশব থেকে পড়াশুনায় আশুতোষের ছিল প্রবল অনুরাগ। মেধা ও স্মৃতিশক্তি ছিল তার অসাধারণ। প্রাথমিক বিদ্যালয়ের ছয় বছরের পাঠ দুই বছরের মধ্যেই শেষ করে ফেলেছিল।

প্রবেশিকা পরীক্ষায় কৃতিত্বের সঙ্গে উত্তীর্ণ হয়ে আশুতোষ ভর্তি হলো প্রেসিডেন্সি কলেজে। গণিতের প্রতি ছিল তার বিশেষ অনুরাগ। উচ্চ গণিত চর্চা করতে হলে ফরাসী ভাষা জানা দরকার। তাই আশুতোষ ফরাসী ভাষাও শিক্ষা করলো। অফুরন্ত তার জ্ঞানের স্পৃহা।

কলেজের ও বিশ্ববিদ্যালয়ের সবগুলি পরীক্ষাতেই কৃতিত্বের সঙ্গে পাশ করলো আশুতোষ। গণিতে এম. এ পরীক্ষায় করলো শীর্ষস্থান অধিকার। পরের বছরেই বিজ্ঞান শাস্ত্রে এম. এ. পরীক্ষা দিয়ে উচ্চস্থান অধিকার করলো। সেই বছরেই প্রেমচাঁদ রায়চাঁদ বৃত্তি পরীক্ষা দিয়ে দশ হাজার টাকা বৃত্তিও লাভ করলো।

ধীরে ধীরে খ্যাতির আসনে অধিষ্ঠিত হলেন আশুতোষ মুখোপাধ্যায়। বি. এল পাশ করে হাইকোর্টে ওকালতি আরম্ভ করলেন। আইন সম্বন্ধে গবেষণা করে অর্জন করলেন 'ডক্টর অব্ ল' উপাধি।

১৯০৬ থেকে ১৯১৩ সাল পর্যন্ত আশুতোষ পর পর চারবার কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের ভাইস-চ্যান্সেলার পদ লাভ করেন। ক্রমান্বয়ে এত অধিকর, এই পদ মর্যাদা লাভের গৌরব আর কারো ভাগ্যে ঘটেনি। আশুতোষের অক্লান্ত চেষ্টার ফলেই কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় বিশ্বের শ্রেষ্ঠ বিদ্যায়তন সমূহের মধ্যে অন্যতম স্থান লাভ করেছে। অনাদৃত বাংলা ভাষাকে বিশ্ববিদ্যালয়ের কক্ষে প্রবেশাধিকার দিয়ে তাকে সর্বোচ্চ পরীক্ষার অন্যতম বিষয়রূপে স্থান দেওয়া একমাত্র আশুতোষের চেষ্টাতেই হয়েছিল। এজন্য বাঙালী জাতি চিরকাল তাঁর কাছে কৃতজ্ঞ থাকবে।

পোষাক পরিচ্ছদে আশুতোষের কোনপ্রকার আড়ম্বর ছিল না। হাইকোর্টে যাওয়ার সময় ছাড়া অন্য সময় তিনি বিজাতীয় পোশাক পরিধান করতেন না।

স্যাড্‌লার কমিশনের সভ্যরূপে একবার তিনি মহীশূর রাজ্যে গিয়েছিলেন। রাজদরবারে কমিশনের সভ্যদের সম্মানার্থে এক ভোজ-সভার আয়োজন হয়। আশুতোষ সাধারণ বাঙালীর পোশাকেই গিয়ে উপস্থিত হলেন। তাঁর নগ্ন মস্তক দেখে রাজমন্ত্রী বললেন—নগ্নমস্তকে কারুর দরবারে প্রবেশ করার নিয়ম নেই। আপনাকে একটি পাগড়ি দিচ্ছি, দয়া করে সেই পাগড়িটি মাথায় ধারণ করুন।

আশুতোষ বললেন—বাঙালী জাতি পাগড়ি ব্যবহার করে না। আমিও এ পর্যন্ত পাগড়ি ব্যবহার করিনি, আজও করবো না। মহারাজকে

আমরা নমস্কার জানিয়ে বলবেন, আমার সভায় যাওয়া হল না। আমি ফিরে চললাম।

মহীশূররাজ ব্যাপারটি জানতে পেরে মন্ত্রীকে তিরস্কার করলেন এবং আশুতোষকে আনবার জন্য যুবরাজকে পাঠিয়ে দিলেন। আশুতোষ তখন দরবারে উপস্থিত হয়ে নিমন্ত্রণ রক্ষা করতে ত্রুটি করলেন না।

জননীর প্রতি আশুতোষের ভক্তি ছিল অসাধারণ। ১৯০২ সালে সম্রাট সপ্তম এডওয়ার্ডের রাজ্যাভিষেক উপলক্ষে ভারতের বড়লাট লর্ড কার্জন আশুতোষকে বিলাতে গিয়ে সেই উৎসবে যোগদানের জন্য নিমন্ত্রণ করলেন। আশুতোষ বিলাত যাত্রার জন্য জননীর অনুমতি চাইলেন। কিন্তু তিনি অনুমতি দিলেন না। আশুতোষ লর্ড কার্জনকে জানালেন জননীর অমতে তিনি বিলাত যাত্রায় অক্ষম।

লর্ড কার্জন বললেন—আপনার মাকে বলবেন, ভারতের রাজ-প্রতিনিধির ইচ্ছা আপনি সম্রাটের অভিষেকে যোগদান করুন।

আশুতোষ জবাব দিলেন—জননীর ইচ্ছার অপেক্ষা আমি আর কারুর ইচ্ছাকে বড় বলে মনে করি না। জননী যখন আমার বিলাত যাওয়া পছন্দ করেন না, তখন কোনমতেই সেখানে আমার যাওয়া হবে না।

আশুতোষ ছিলেন পরম দয়াবান ও দানশীল। বহু দরিদ্র পরিবার তাঁর দানে বিপদ থেকে রক্ষা পেয়েছে। কত দরিদ্র ছাত্র যে তাঁর চেষ্টায় ও সাহায্যে শিক্ষালাভ করে জীবনে প্রতিষ্ঠা লাভ করেছে তার সংখ্যা নেই।

আশুতোষের হৃদয় যেমন কুসুমের মত কোমল ছিল, তেমনি তিনি ছিলেন বজ্রের মত কঠোর। বিপদে ও আত্মসম্মান রক্ষায় তিনি ছিলেন নির্ভীক। এ জন্যই তিনি 'বাংলার বাঘ' নামে পরিচিত ছিলেন।

।। অনুশীলনী ।।

১. আশুতোষকে 'বাংলার বাঘ' বলা হয় কেন ? তাঁর জীবনের ঘটনাবলীর সংক্ষিপ্ত পরিচয় দাও।

২. জননীর প্রতি আশুতোষের ভক্তির পরিচয় দাও। তিনি কেন মহীশূর রাজদরবারে প্রবেশ করেননি ?

৩. আশুতোষের শিক্ষার ও কর্মজীবনের পরিচয় দাও। কলিকাতা বিশ্ব-বিদ্যালয়ের ভাইস চ্যান্সেলার থাকাকালীন তিনি বাংলাদেশের জন্য কি করে-ছিলেন ?

৪. 'ওখানে গিয়ে কি হবে ?'—কোথায় ? বক্তা যেতে কেন অস্বীকার করলেন ? কে তাঁকে ওখানে পাঠিয়েছিলেন ? তাঁর পরিচয় কি ?

৫. 'শৈশব থেকে পড়াশুনায় আশুতোষের ছিল প্রবল অনুরাগ'—আশুতোষের পড়াশুনার একটা সংক্ষিপ্ত পরিচয় দাও। এতে প্রবল অনুরাগের কি পরিচয় পেয়েছ ?

৬. 'এজন্য বাঙালী জাতি চিরকাল তাঁর কাছে কৃতজ্ঞ থাকবে'—কার কাছে ? তিনি কৃতজ্ঞতার কি কাজ করেছিলেন ? বাঙালী কৃতজ্ঞ হবে কেন ?

৭. 'আমার সভায় যাওয়া হল না'—কার ? কোন্ সভায় ? সেই সভায় কেন তাঁর যাওয়া হোল না ? এতে কি ঘটনা ঘটল এবং বক্তার কী পরিচয় পাওয়া গেল ?

৮. 'তিনি অনুমতি দিলেন না'—কে কাকে অনুমতি দেননি ? কিসের অনুমতি ? অনুমতি না পাওয়ার ফলে কী হোল ?

৯. অর্থ লেখ : নির্ভীক, লব্ধপ্রতিষ্ঠ, প্রখর, অনুরাগ, মেধা, অফুরন্ত, স্পৃহা, অধিষ্ঠিত, অক্লান্ত, কৃতজ্ঞ, নগ্নমস্তক, অসাধারণ, রাজ্যাভিষেক, দানশীল, কোমল, আত্মসম্মান, অনাদৃত।

১০. বাক্য রচনা কর :

পরাধীন, নির্ভীক, লব্ধপ্রতিষ্ঠ, কৃতিত্ব, অফুরন্ত, অধিষ্ঠিত, ক্রমান্বয়ে, অক্লান্ত, বিজাতীয়, সম্মানার্থে, দরবার, উপলক্ষে, অনুমতি, অভিষেক, দয়াবান, কুসুমিত, পরিচিত।

১১. পদ পরিবর্তন কর : নির্ভীকতা, তেজ, প্রখর, প্রবল, জ্ঞান, অর্জন, পরিধান, ব্যবহার, তিরস্কার, অভিষেক, ইচ্ছা, বিলাত, দরিদ্র, কোমল, কঠোর, পরিচিত।

Some incidents of Sir Ashutosh's life.



কুইনিন আবিষ্কার

—অমর নাথ রায়

[মানুষ তার অজান্তে মধ্যে মধ্যে এমন কিছু আবিষ্কার করে ফেলে যা জগতে নূতন একটি দিকের আলোকপাত করে। লেখক অমর নাথ রায় এখান গল্পের মাধ্যমে একটি আবিষ্কারের উল্লেখ করেছেন, যা এক সময় জগদ্বাসীকে একটা মারাত্মক রোগ থেকে মুক্তি দিয়েছে।]

অনেক অনেকদিন আগেকার কথা। তখন ম্যালেরিয়া রোগের কথা কেউ জানতো না। জানতো না যে অ্যানোফিলিস জাতীয় স্ত্রী মশকটির কামড়ে এ রোগটি হয়, আর এ রোগের ওষুধ হচ্ছে 'কুইনিন'।

দক্ষিণ আমেরিকায় 'পেরু' নামে একটি জায়গা আছে। যে সময়ের কথা বলছি তখন পেরু ছিল জঙ্গলময় দেশ। পেরুর কোনও এক জঙ্গলে এক শিকারী বাস করতেন। একদিন সেই শিকারী গেলেন শিকারে। কিন্তু অনেক ঘোরাঘুরি করেও শিকার পেলেন না। ঘোরা-ঘুরির ফলে তিনি খুব ক্লান্ত হয়ে পড়লেন। তাঁর খুব তেষ্টা পেলো। কিন্তু তিনি জঙ্গলের এমন এক জায়গায় গিয়ে পড়েছিলেন যেখানে ছিল জলের অভাব।

তৃষ্ণায় কাতর হয়ে অনেক ঘোরাঘুরির পর ঐ শিকারী বনের এক প্রান্তে এক জায়গায় একটি ডোবা দেখতে পেলেন। তার জল খুব বেশী ছিল না। যেটুকু ছিল সেইটুকুতেই পাড়ের কতকগুলি গাছের ডালপালা পড়ে পচে জলের রং সবুজ হয়েছিল। তিনি সেই জলই আঁচলা ভরে তুলে পান করলেন। তাতে তেষ্টা মিটলো বটে কিন্তু তৃপ্তি

হলো না। কারণ সাধারণ জলের মত সে জলের রং, স্বাদ ও গন্ধ কোনটাই ছিল না। সে জলের রং ফিকে সবুজ। তাতে কেমন যেন একটু গন্ধ। আর স্বাদও তার তেতো। যাই হোক তেষ্টা তো মিটলো। শিকারী ফিরে গেলেন ঘরে।

শিকারীর রোজ জ্বর হতো। তিনি ভাবলেন—সেদিনও জ্বর আসবে। কিন্তু সেদিন জ্বর এলো না। পরের দিনও না। তার পরের দিনও না। শরীরটাও বেশ ভাল বোধ করলেন শিকারী। মনে আনন্দও পেলেন।

শিকারী ভাবতে লাগলেন—কেন এমন হলো? ও যতো ভাবত ততই ডোবার জল পানের কথা তাঁর মনে পড়ে যেত। তবে কি ঐ জলেই জ্বরের কোন ওষুধ মিশে ছিল?

ব্যাপারটা ভাল করে জানবার ও বুঝবার জন্য শিকারী আবার গেলেন জঙ্গলের সেই জায়গায়—সেই ডোবার ধারে। লক্ষ্য করলেন সেই ডোবার পাড়ে কতকগুলো ছোট ছোট গাছ রয়েছে। গাছ গুলো তার অজানা। গাছের কিছু কিছু ডাল পালা জলের মধ্যে ডুবে রয়েছে। দু চারটি পাতা জলে ভাসছে। শিকারী ঐ গাছের কয়েকটি পাতা ছিঁড়ে নিয়ে তার গন্ধ শুঁকলেন, চিবিয়ে স্বাদও অনুভব করলেন। হ্যাঁ, জলেও তো ঐ গাছের পাতার গন্ধ আর তেতো স্বাদ পেয়েছিলেন তিনি সেদিন।

শিকারী বুঝলেন যে এই গাছের ডাল ও পাতার ভেষজ গুণের ফলেই তাঁর জ্বর সেরেছে। তিনি ঐ গাছের কয়েকটি ডাল ভেঙ্গে নিয়ে ঘরে ফিরে গেলেন। অনেককেই জানালেন গাছটির গুণের কথা। তারপর থেকে স্থানীয় বহু লোক জ্বর হলে ঐ গাছের ডাল ও পাতার আরক খেয়ে সুস্থ হয়ে উঠতে লাগলো। বোঝা গেল—পেরুর জঙ্গলের ঐ বুনো উদ্ভিদটির ভেষজ গুণ অসামান্য।

১৬৪০ খ্রীষ্টাব্দের কথা। পেরুর বড়লাট তখন 'কাউন্ট অফ সিন কন্'। বড়লাটের স্ত্রীর সে বার খুব জ্বর হলো। অনেক চিকিৎসাতেও সে জ্বর ছাড়লো না। শেষে স্থানীয় এক বদ্যি ঐ শিকারীর আবিষ্কৃত বুনো-গাছের ছালের আরক খাওয়ালেন কাউন্টেসকে। তাতেই জ্বর ছাড়লো।

সেই থেকে কাউন্ট অফ সিন্‌কনের নাম অনুসারে ঐ বুনো উদ্ভিদের নাম রাখা হলো 'সিনকোনা।'

এই সিনকেনোর ছাল থেকে 'কুইনিন' আবিষ্কার করেন দু'জন বিদেশী বিজ্ঞানী। তাঁদের নাম 'পেলটিয়ার' ও 'ক্যাভে-টু'। আবিষ্কারের কাল ১৮২০ খ্রীষ্টাব্দ। এই বিজ্ঞানীরা পরীক্ষা করে দেখেন যে, সিনকোনার ছালে কতকগুলো ক্ষারধর্মী জৈব পদার্থ আছে। সেগুলিকে বলা হয় উপক্ষার। সিনকোনার উপক্ষারগুলোর মধ্যে কুইনিন অন্যতম। কুইনিন ছাড়াও সিনকোনার ছালে আছে কুইনিডিন, সিনকোনিন, সিনকোনিডিন প্রভৃতি আরও কতকগুলি উপক্ষার। এই সব উপক্ষারের জন্যই সিনকোনার ভেষজ গুণ।

কুইনিন ম্যালেরিয়া জ্বরের অব্যর্থ ওষুধ। আর এর জন্যেই আমরা আজ আর ম্যালেরিয়া রোগ কোথাও দেখতে পাই না। অজান্তে এই আবিষ্কার নতুন দ্বারের উদ্‌ঘাটন করল।

॥ অনুশীলনী ॥

১. 'পেরু' কোথায়? 'পেরু' কি? সেখানে কে থাকত এবং কি করত? তৃষ্ণার্ত হয়ে তিনি কি করেছিলেন? 'ম্যালেরিয়া' কিভাবে হয়?

২. শিকারীর জ্বর কখন থেকে আর হোল না? জ্বর না হওয়ায় কি কারণ তিনি খুঁজে পেলেন?

৩. 'কুইনিন' নাম হল কোথা থেকে এবং কি ভাবে? কখন তা আবিষ্কৃত হয়? 'কুইনিন' ছাড়া আর কি কি পাওয়া গেল? কুইনিনের স্বাদ কেমন?

৪. 'কুইনিন' আবিষ্কারের কাহিনীটি বর্ণনা কর।

৫. বাক্য রচনা কর: জঙ্গলময়, ক্লান্ত, তৃপ্তি, স্বাদ, অনুভব, ভেষজ, আবিষ্কার, উদ্‌ঘাটন।

৬. পদ পরিবর্তন কর: ক্লান্ত, তৃপ্তি, স্বাদ, অনুভব, আবিষ্কার, উদ্‌ঘাটন, জল, গাছ।

A Story of Scientific discovery

আন্দামান অভিযান



—গৌর গোপাল দেব

[এই অভিযানটি বাঙালীর অভিযান। এশিয়া মহাদেশে প্রথম জলপথে নৌকায় অভিযান। এই অংশে অভিযানটির ভয়াবহতা ও দুঃসাহসিকতার কথাই প্রকাশিত হয়েছে।]

ছোট্ট একটি নৌকায় দুস্তর সমুদ্রের বক্ষে অভিযান চালিয়ে যাওয়া দুঃসাহসিকতারই কাজ! দুই দুঃসাহসী তরুণ 'ডিউক' ও 'পিনাকি' নিজেদের জীবন তুচ্ছ করে চালিয়েছিল এই দুঃসাহসিক অভিযান। এক মাসের মধ্যে উত্তাল বঙ্গোপসাগর পার হয়ে আন্দামানে পৌঁছে তারা যে অসীম সাহসিকতার এবং অপূর্ব মনোবলের পরিচয় দিয়েছিল তা শুধু ভারতেরই নয়, বিশ্বেরও গর্বের বিষয়।

ডিউক ও পিনাকি—একজন ভারতীয় নৌবাহিনীর লেফ্‌টেন্যান্ট জর্জ অ্যালবার্ট ডিউক, অপর জন কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের শরীর বিদ্যার গবেষক শ্রীপিনাকি রঞ্জন চ্যাটার্জী। উভয়েই সুস্বাস্থ্যের অধিকারী, উভয়েই নৌকা চালনায় অভিজ্ঞ। ওয়ারলেস, সিগন্যালিং, প্রাথমিক চিকিৎসা সম্বন্ধেও উভয়েরই জ্ঞান অসীম। দু'জনেই তরুণ। প্রথম জনের বয়স ২৫, দ্বিতীয় জনের বয়স ২২। ১৯৭০ সালের ১লা ফেব্রুয়ারীতে বেলা ৩টায় যাত্রা হোল শুরু, কলকাতার 'ম্যান ও ওয়ার' জেটি থেকে দাঁড় টানা নৌকাটি ভেসে পড়ল ডিউক ও পিনাকিকে নিয়ে উত্তাল সমুদ্রবক্ষে, আন্দামানের পথে।

যাত্রা সুরু করে প্রথম দিনে বাটানগর, বজবজ, বিড়লাপুর হয়ে রয়াপুর এই ২০ মাইল পথ অগ্রসর হোল এই অভিযাত্রীদ্বয়। পরের দিন ডায়মণ্ডহারবার এবং ৩রা ও ৪ঠা ফেব্রুয়ারী মিডলটন বার এবং গ্যাসপার ও ইন্টারমিডিয়েট চ্যানেল পার হয়ে ৫ই ফেব্রুয়ারী স্যাণ্ডহেড্‌স্ অর্থাৎ

অকূল দরিয়ায় পা দিল। অভিযাত্রীদ্বয় পার হয়ে এল মাত্র ১৩১ মাইল। কিন্তু তাদের যাত্রা হাজার মাইলের। উত্তাল সমুদ্র, মোচার খোলের মত সামান্য একটা ডিঙ্গি। এই নিয়ে তাদের যাত্রা।

এ ধরণের অভিযান এশিয়াতে এই প্রথম। ১৯৬৬ সালে ব্রিটেনের রোজার ও ব্লাইথ যুক্তরাষ্ট্র থেকে দাঁড় বেয়ে আটলান্টিক পার হয়েছিলেন, পৌঁছোছিলেন আয়ারল্যাণ্ডে। স্যার ফ্রান্সিস চিসেস্টার, আলেক্স রোজ ও উইল ফ্রায়েভ অ্যারড্‌ম্যান নৌকায় করেছিলেন বিশ্বপরিক্রমা। তারপর এশিয়ার এই অভিযাত্রীদ্বয় ডিউক ও পিনাকি। এদের সামনে প্রেরণা বলতে এরাই—ঐ অভিযাত্রীর দল, আর তাদের নিজেদের দুর্দম সাহস, দুর্জয়কে জয় করার কামনা। ঈশ্বর ছাড়া আর কি ভরসা আছে তাদের জীবনে!

দাঁড় টেনে টেনে অভিযাত্রীরা বেশ ভালই অগ্রসর হচ্ছিল। কোন বিড়ম্বনা ছিল না, পথে ছিল না কোন বাধা বা বিঘ্ন। কিন্তু বিধি বাম। কলকাতা থেকে ১৮১ সমুদ্র-মাইলের মধ্যে হঠাৎ চরম বিপদ এগিয়ে এল। একদিন রাত্রে সমুদ্রের জল উঠল ফেঁপে ফুলে। সমুদ্র ভীষণ তাণ্ডবে উঠল মেতে। গৌহাটি ও ইন্দোনেশিয়ায় ভূমিকম্পে সমুদ্র একেবারে তোলপাড়, উত্তাল, উন্মত্ত। ওরা তখন ঘুমিয়ে। সমুদ্রের গর্জন শুনে পিনাকি উঠল, ডিউককে তুলে দিল ঘুম থেকে, দ্রুত নৌকায় ও কোমরে দড়ি বেঁধে নিল তারা। জল ফেঁপে উঁচু হয়ে উঠলো ২০ ফুট। শুরু হল মৃত্যুর সঙ্গে মারাত্মক লড়াই। হাতে কড়া পড়েছিল দাঁড় টানতে টানতে, এখন নৌকা সামলাতে হাতের তালুর চামড়া গেল ছিঁড়ে, ছিঁড়ে গেল পিনাকির ডান হাতের পেশী বন্ধনী। ক্রমে দাঁড় বাওয়াই অসম্ভব হয়ে উঠল। ওয়ারলেসের যোগাযোগ গেল ছিন্ন হয়ে, ছিন্ন হোল জগতের সঙ্গে যোগাযোগ।

পুরো ৭২ ঘণ্টা ধরে চলল জীবন যুদ্ধ। তিন দিন তিন রাত্রি কখনো সমুদ্রের জলে, আবার ঝড় একটু কমলে নৌকা সোজা করে পাম্পের সাহায্যে জল ফেলে দিয়ে কখনও নৌকার উপরে। আবার ঝড়—আবার ঢেউ। আবার উল্টেছে নৌকো। নৌকোর ভিতরে জাল দিয়ে সব বাঁধা—নইলে বাকী দিনগুলো তাদের অনাহারে কাটাতে হত। নৌকো হালকা করার জন্য পানীয় জল ফেলে দিতে হয়েছে। নৌকার হাল ও পাল ছিঁড়েছে, পরণের পোশাকও গেছে ছিঁড়ে। অবসাদ আর হতাশায় দেহ-মন ওদের ভেঙ্গে পড়ার উপক্রম।

তিন দিন পরে থামল ঝড়। এই ৭২ ঘণ্টার লড়াইয়ে ঈশ্বর ছাড়া তাদের আর কেউ দেখার ছিল না। এখন সমুদ্র পুরোপুরি শান্ত। দুজনেই অসম্ভব শ্রান্ত। দুজনেরই জ্বর। কিন্তু থেমে থাকবার কোন উপায় নেই। আবার উঠতে হল, আবার ধরতে হল দাঁড়। এগিয়ে চল—এগিয়ে চল। মাস্তুল দুমড়েছে, ভেঙ্গেছে হাল। তবুও থেমে থাকলে চলবে না, এগিয়ে যেতে হবে।

বঙ্গোপসাগর জীব জন্তুতে ভরা। অর্ধেক পথ হাঙর, শুশুক ওদের অনুসরণ করে এসেছে। মাঝে মাঝে হাঙর তাড়াতে হয়েছে বিষ দিয়ে। তবে ঝড়ে ওদের উপকার হয়েছিল অনেক। পাঁচ দিনের পথ ওরা তিন দিনে এগিয়ে এল। ২রা মার্চ সকালে ওদের চোখে পড়লো মাটির নিশানা। রেপিয়ার দ্বীপ। তারপর কোকোদ্বীপ, ল্যাণ্ডফল দ্বীপ। এখন ওরা আন্দামানের চৌহদ্দীর মধ্যে কোকো থেকে ৪০ মাইল জলপথে ওদের বেশ কষ্ট হোল। এই পথটুকু লাগলো দু'দিন। নৌকা ভিড়িয়ে ম্যাপ দেখে নিশ্চিন্ত হোল অভিযাত্রীরা—হ্যাঁ, এইটাই ল্যাণ্ডফল দ্বীপ। তেত্রিশ দিন পরে ওরা পৌছাল আন্দামানে। দেশমাতৃকাকে প্রণাম জানিয়ে জাতীয় পতাকা তুলে দিল ল্যাণ্ডফল দ্বীপে দুই দুঃসাহসী, নির্ভীক অভিযাত্রী।

॥ অনুশীলনী ॥

১. কলকাতা থেকে আন্দামান পর্যন্ত নৌকা অভিযানটি বর্ণনা কর।

২. কখন ডিউক ও পিনাকি সমুদ্রের মধ্যে বিপদে পড়েছিল? সেই বিপদের কাহিনীটি বর্ণনা কর।

৩. 'ঝড়ে ওদের উপকার হয়েছিল অনেক'—ঝড়ের বর্ণনা দাও। ঝড় তাদের কী উপকার করেছিল?

৪ সাধু ভাষায় পরিবর্তিত কর: আবার উল্টেছে নৌকো। নৌকোর ভিতরে জাল দিয়ে সব বাঁধা—নইলে বাকী দিনগুলো ওদের অনাহারে কাটাতে হত। নৌকো হালকা করার জন্য পানীয় জল ফেলে দিতে হয়েছে।

The story of an adventurous journey.



[উনবিংশ শতাব্দীতে স্বদেশী আন্দোলনের পুরোধায় ছিল বাঙালী। যে সকল বাঙালী নেতা এই আন্দোলনের ব্রতী হয়েছিলেন তাদের মত ও পথই প্রবন্ধটিতে আলোচিত হয়েছে।]

বাংলাদেশ আর বাঙালী চিরকালই ভারতকে পথ দেখাইয়াছে। ভারতের স্বাধীনতা আন্দোলনে বাঙালী আসিয়াছে সর্বাগ্রে। আজ ভারত স্বাধীন হইয়াছে। কিন্তু দেশের মুক্তি সংগ্রামে যে সকল বাঙালী আত্মদানে ব্রতী হইয়াছেন তাঁহাদের আমরা কোনোদিনই ভুলিতে পারিব না। তাঁহারা চিরকালই আমাদের নমস্য।

প্রথমেই বলা যাক রামমোহন রায়ের কথা। তিনিই বর্তমান ভারতের জন্মদাতা। বিদেশী শাসকদের অত্যাচারের বিরুদ্ধে তাঁহার কণ্ঠেই প্রথম প্রতিবাদের সুর ধ্বনিত হইয়াছিল। তিনি ছিলেন আমাদের সমাজ, ধর্ম ও শিক্ষা-সংস্কারের আন্দোলনের পুরোভাগে। তাঁহার প্রেরণায় দিকে দিকে মানুষ জাগিয়া উঠিয়াছিল, দেশের মাটিতে স্বাধীনতা সংগ্রামের ভিত হইয়াছিল পাকা।

রামমোহন রায়ের পরে যাঁহারা দেশের মাটিকে পরাধীনতার শৃঙ্খল হইতে মুক্তিদান করিয়াছিলেন, তাঁহারা সকলেই ছিলেন মুক্তিপথের পথিক/ রাষ্ট্রগুরু সুরেন্দ্রনাথব ন্দ্যোপাধ্যায় ছিলেন তাঁহাদের মধ্যে অন্যতম। দেশের দাবীকে ভাষা দিবার জন্য সুরেন্দ্রনাথ গড়িয়া তুলিলেন ভারতসভা। জাতীয় জাগরণ ও আন্দোলনের সূত্রপাত হইল। কেবল বাংলাদেশেই নয়, বাংলার বাহিরেও এই আন্দোলন ছড়াইয়া পড়িল। সুরেন্দ্রনাথ

ছিলেন বাগ্মী ও লেখক। বক্তৃতার দ্বারা, সুতীক্ষ্ণ লেখনীর সাহায্যে তিনি ইংরাজদের বিরুদ্ধে এই আন্দোলনকে জোরালো করিয়া তুলিলেন। পাইলেন রাষ্ট্রগুরু আখ্যা। যুবসমাজকে আন্দোলনের পুরোভাগে দাঁড়াইবার প্রেরণায় উদ্বুদ্ধ করিলেন সুরেন্দ্রনাথ।

আসিল ১৯০৫ সাল। লর্ড কার্জনের নির্দেশে বাংলাদেশ হইল দ্বিখণ্ডিত। শুরু হইল প্রত্যক্ষ সংগ্রাম। দিকে দিকে ধ্বনিত হইল তীব্র প্রতিবাদের সুর। ইংরাজ শাসকগণের দৃঢ়তা ধূলায় লুণ্ঠিত হইল। রদ হইল বঙ্গভঙ্গ। জাতির অটুট সংকল্প ও অনমনীয় দৃঢ়তার নিকট পরাস্ত হইল ইংরাজ শাসকগণ। বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথ তাঁহার গানে, কবিতায়, প্রবন্ধে ও বক্তৃতায় এই আন্দোলনকে করিলেন প্রাণবন্ত। আর সেই বঙ্গভঙ্গ আন্দোলন স্বদেশী আন্দোলনের রূপ লইয়া ছড়াইয়া পড়িল বাংলার আকাশে-বাতাসে, বাঙালীর অন্তরে অন্তরে।

বিপিনচন্দ্র পাল ও ঋষি অরবিন্দ ঘোষ আবির্ভূত হইলেন। বিপিনচন্দ্র পাল ছিলেন অসাধারণ বাগ্মী। ইংরাজী ও বাংলা উভয় ভাষাতেই তিনি ছিলেন সমান দক্ষ। তাঁহার সিংহনাদে ভীত হইয়া পড়িলেন ব্রিটিশ সিংহ। ঋষি অরবিন্দের মধ্যে ছিল স্বাধীনতাকামী ভারতের ধ্যানী মূর্তি। পরাধীনতার শৃঙ্খলমোচনই হইল ভারতের মুক্তির পথ। স্বাধীনতার সংগ্রামের মধ্যে যে উগ্র জাতীয়তাবোধ দেশের বুকে নামিয়া আসিয়াছিল তাহার একমাত্র ধারক ও বাহক ছিলেন ঋষি অরবিন্দ। অরবিন্দের জীবনের ইতিহাস নবজাগ্রত জাতীয় জীবনেরই ইতিহাস।

বিপিনচন্দ্র পাল, অরবিন্দ যে মুক্তিপথের বাণী প্রচার করিলেন তাহারই পথ ধরিয়া নামিয়া আসিল বাংলার তরুণরা। স্বদেশপ্রেমকেই তাহারা জীবন পথের একমাত্র বাণী হিসাবেই গ্রহণ করিল। ১৯০৮ সালে মজঃফরপুরে বোমা ফাটিল বাঙালীরই হাতে। প্রফুল্ল চাকী আত্মহত্যা করিয়া প্রমাণ করিল বাঙালী যুবকেরা আত্ম বলিদানে ভীত নয়। বিপ্লবী ক্ষুদিরাম ফাঁসির মঞ্চে দাঁড়াইয়া বাঙালীকে তথা ভারতবাসীকে শোনাইল জীবনের জয়গান। বিপ্লবী বাঙালী হইল ভারতের পথপ্রদর্শক।

ইহার পরে যে অধ্যায় শুরু হইল বাঙলার মাটিতে তাহার পুরোধা হইয়া আসিলেন মহাত্মা গান্ধী—মোহনদাস করমচাঁদ গান্ধী। গান্ধীজী প্রচার করিলেন 'আমার জীবনই আমার বাণী'। তিনি বলিলেন, 'একমাত্র অস্ত্র অহিংস সত্যাগ্রহ'। তাঁহার নেতৃত্বে অহিংসার পথে কংগ্রেসের মুক্তি আন্দোলন শুরু হইল। ১৯২২ সালে হইল অসহযোগ, ১৯৩০ সালে আইন অমান্য আন্দোলন এবং ১৯৪২ সালে 'ভারত ছাড়ো' আন্দোলন। সারা ভারত ব্যাপী এই আন্দোলনে বাঙালীও পিছাইয়া রহিল না। গান্ধীজীর এই মুক্তি আন্দোলনের নবপর্যায়ের ডাকে সাড়া দিলেন দুই বাঙালী মুক্তি সাধক—দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন দাস এবং নেতাজী সুভাষচন্দ্র বসু।

দেশবন্ধু ছিলেন কবি, ভাবুক, হৃদয়বান মহাপুরুষ। তিনি ছিলেন আত্মত্যাগী স্বদেশ প্রেমিক, ছিলেন ভারতখ্যাত ব্যারিষ্টার। ব্যারিষ্টারীতে তাঁহার আয় ছিল মাসিক দুই হাজার টাকা। মহাত্মাজীর আহ্বানে তিনি স্থির থাকিতে পারিলেন না। ব্যারিষ্টারী ত্যাগ করিয়া তিনি দেশ-প্রেমে ব্রতী হইলেন। এক মুহূর্তে রাজার দুলাল হইল পথের ভিখারী। দেশবাসীর নিকট তিনি হইলেন মুকুটহীন রাজা।

দেশবন্ধুর পরে দেখা দিলেন সংগ্রামী বীর নেতাজী সুভাষ। নেতাজী দেশবন্ধুর সুযোগ্য শিষ্য ছিলেন। দেশের মুক্তি সাধনই ছিল তাঁহার জীবনের একমাত্র ব্রত। দুই দুইবার তিনি কংগ্রেসের সভাপতি নির্বাচিত হন। কিন্তু তিনি ছিলেন মনে প্রাণে বিপ্লবী। তাই ইংরাজ সরকারের সঙ্গে তিনি কোনো মতেই আপোস করিতে চাহেন নাই। তিনি চাহিয়া-ছিলেন পূর্ণ স্বাধীনতা। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সময় তিনি অতি সহজে পুলিশের চোখে ধুলি দিয়া নজরবন্দী হইতে মুক্তি লাভ করেন। ছদ্ম-বেশে পার হন ভারত সীমান্ত। তাহার পরে চলে স্বাধীনতা সংগ্রামের জন্য প্রস্তুতি। ভারতের বাহিরে যে সকল ভারতীয় সৈন্য বন্দী হইয়াছিল, তাহাদের লইয়া তিনি গড়িয়া তুলিলেন 'আজাদ হিন্দ্ ফৌজ' বা ভারতবাহিনী। তাঁহার উদার আহবানে দক্ষিণ পশ্চিম এশিয়ার হিন্দু মুসলমান, বাঙালী-অবাঙালী সকলেই এক পতাকাতলে সমবেত হয়।

নেতাজীর নেতৃত্বে শুরু হয় স্বাধীনতার সংগ্রাম। 'দিল্লী চলো' হইল সেই সংগ্রামের অন্যতম বাণী। আজও এই বাণী বাংলাদেশের আবাল-বৃদ্ধ-বণিতার অন্তরে নিরন্তর ধ্বনিত হইয়া আসিতেছে। সুতরাং, ভারতের মুক্তি আন্দোলন বাংলাদেশেই সুরু, বাংলাদেশেই তাহার পরিপুষ্টি।

॥ অনুশীলনী ॥

১. স্বাধীনতা আন্দোলনে বাঙ্গালী নেতৃত্বের অবদানটি সংক্ষেপে আলোচনা কর।

২. বঙ্গভঙ্গ আন্দোলন কোন্ সময় হয়েছিল ? বঙ্গভঙ্গ হবার নির্দেশ প্রচারিত হবার পর কি ঘটল ? এই প্রসঙ্গে বিপিনচন্দ্র পাল ও ঋষি অরবিন্দের পরিচয় দাও।

৩. মহাত্মা গান্ধীর কার্যকলাপ থেকে আমরা কি জানতে পারি ? মহাত্মাজীর মন্ত্র কি ছিল ?

৪. নেতাজীর দেশ স্বাধীন করবার উপায়টি বর্ণনা কর।

৫. 'ভারতের মুক্তি আন্দোলন বাংলাদেশেই শুরু, বাংলাদেশেই তাহার পরিপুষ্টি'—কোন্ প্রসঙ্গে এই উক্তি ? মূল অর্থটি পরিস্ফুট কর।

৬. রামমোহন, দেশবন্ধু, ঋষি অরবিন্দ সম্পর্কে তোমার ধারণাটি লিপিবদ্ধ কর।

৭. 'তাঁহারা চিরকালই আমাদের নমস্য'—কারা ? তাঁরা কিভাবে ও কেন আমাদের নমস্য হয়ে আছেন তা বিবৃত কর।

৮. 'রদ হইল বঙ্গভঙ্গ'—বঙ্গভঙ্গ কত খ্রীস্টাব্দে হয়েছিল ? তা রদ হোল কিভাবে ? কে কি ভাবে আন্দোলনকে প্রাণবন্ত করে তুলেছিলেন ?

৯. 'বিপ্লবী বাঙালী হইল ভারতের পথপ্রদর্শক'—দু'একজন বিপ্লবী বাঙালীর নাম কর। তাঁরা কিভাবে আত্মাহুতি দিয়েছেন ? তাঁদের 'ভারতের পথপ্রদর্শক' বলা হয় কেন ?

১০. 'দেশবাসীর নিকট তিনি হইলেন মুকুটহীন রাজা'—'তিনি' কে ? কিভাবে তিনি দেশের কাজে ব্রতী হলেন ? তাঁকে 'মুকুটহীন রাজা' বলা হয় কেন ?

১১. 'দেশের মুক্তি সাধনাই ছিল তাঁহার জীবনের একমাত্র ব্রত'—কার ? তিনি কিভাবে দেশের মুক্তি চেয়েছিলেন ? এর জন্য তিনি কি করেছিলেন ? তাঁর বাণীটি কি ছিল ?

Contributions of some national